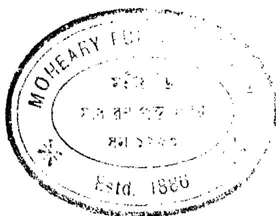
লীলা মৃগয়া



লীলা মৃগয়া

শচীন্দ্র মজুমদার





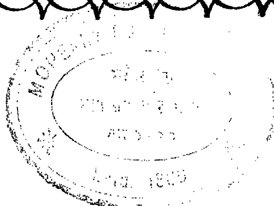
সিগ্‌নেট প্রেস : কলিকাতা



প্রথম সংস্করণ বৈশাখ ১৩৫৩
প্রকাশক
দিলীপকুমার গুপ্ত
সিগনেট প্রেস
১০।২ এলগিন রোড
প্রচ্ছদপট
সত্যজিৎ রায়
মুদ্রাকর
শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
প্রভু প্রেস
৩০ কর্নওআলিস স্ট্রীট
প্রচ্ছদপট মুদ্রন
গসেন অ্যাণ্ড কোম্পানি
৭।১ শ্রীনাথদাস লেন
বাঁধিয়েছেন
বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৫০ পটলডাঙা স্ট্রীট

দাম তিন টাকা





শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার মুখোপাধ্যায়

পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু—



মুখবন্ধ

আমার এই উপন্যাসটির নায়ক-নায়িকারা সম্পূর্ণভাবে কাল্পনিক। স্থূলদেহে তাদের খুঁজে পাওয়া অসম্ভব কথা। গ্রীক শিল্পযুগের তৃতীয় অব্দে তক্ষণশিল্পীরা যেমন বহু ব্যক্তির দেহের সুন্দরতম অংশগুলি একত্র করে এক-একটি সমগ্র শিল্পরচনা করে গেছেন, আমার নায়িকারাও তেমনি ভিনস্ ক্যালিপোগসের মতো। তারা নানা জনের নানা প্রকাশের একত্রগ্রথিত রূপ। ইংরাজ লেখক সম্প্রদায় একটা বাক্য ব্যবহার করেন—*Getting under the skin of one's creation*—আমি নানাজনকে একত্র করে সেই চেষ্টা তন্ময় হয়ে করেছি মাত্র।

নারী একাধারে কন্যা ভগ্নী মাতা প্রিয়া নটি। নটিরূপাই উপন্যাস রচনার অন্যতম বড়ো সহায়। পাঠক তৃপ্ত হতে পারেন তাকে দিয়ে, কিন্তু লেখক তাকে নিয়ে পড়েন চরম পরীক্ষায়, তাঁর মনে প্রশ্ন ওঠে—নটির প্রকাশের শেষ কোথায়? ভাঙায়, না গড়ায়?

এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন *Dr Th. Van de Velde: 'True Coquetry is an end in itself, it pursues no aim. At least, the appearance of flirtation is deceptive, although it may have other objects in view such as cruelty, revenge, selfishness, vanity, calculation. This Coquetry for its own sake, of course, betrays a person who—*

without detracting from other beautiful intellectual gifts—is unable to love...'

'Getting under the skin'—এর সুবিধা এই যে আমার লেখনী এই বিচিত্র জটিল পথে আপনি খর-গতিতে চলেছে ও আপনি থেমেছে, আমার ইচ্ছার দ্বারা বাহিত হয়নি।

সুন্দর শব্দ ও বাক্য সংগ্রহ করা আমার স্বভাব। সে কারণে কবিগুরু আমার আত্মাকে ছেয়ে আছেন। খুব সম্ভব গান ছাড়া কবিগুরুর আরো অনেক কিছু এ-রচনায় আছে, হয়তো শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয়েরও অনেক শব্দ ও বাক্যের প্রভাব আমি রচনার অচেতন ক্ষণে এড়াতে পারিনি। এ-কথা স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই।

'সিল্‌ভ্যরওক্‌স্‌' : ল্যুকর রোড
এলাহাবাদ : ১লা বৈশাখ ১৩৫৩

—**শচীন্দ্র মজুমদার**





বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস
লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ।
কৃষ্ণের সহায়, গুরু, বান্ধব প্রেয়সী,
গোপিকা হয়েন প্রিয়া, শিষ্যা, সখি, দাসী।
পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস,
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস।
অতএব কহিলাম করিঞা নিগূঢ়,
বুঝিবে রসিকজন না বুঝিবে মূঢ়।

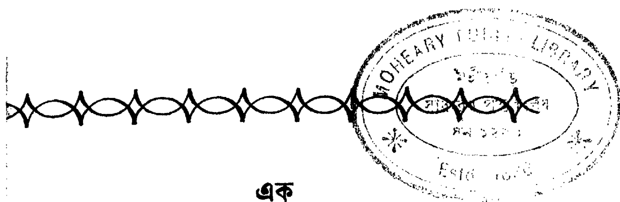
—শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত





লীলা মৃগয়া





এক

রে ঘনসবুজ ঠাণ্ডা ঘাস-জমির ওপর তিনটি ব্রিজ-রসিকের দল সিগারের নীল ধোঁয়ার আকাশের নিচে নীরবে খেলায় মশগুল। অশোক ঙ্গী না পেয়ে দারুণ গরমেও বিলিয়র্ড-কামরায় একা-একা শক্ত কয়েকটা ক্যানন অভ্যাস করছিলো। ব্রিজ খেলতে জানলেও সে ও বিষয়ে প্রায় আনাড়ি; ব্রিজ-মাতালেরা তাকে সহজে দলে নিতে চায় না। সে বাজী রেখে খেলে না সেও একটা কারণ। তাছাড়া বিলিয়র্ডস্ অশোকের প্রবল নেশা, রোজ খানিকটা না খেললে দিনটি তার বৃথা মনে হতো। অশোক ক্যানন করতে করতে বেণীর আগমনের প্রতীক্ষা করছিলো। বেণী এই ক্লাবের মার্কার ও হেড-খিদমতগার। সে টেনিস খেলায়, বিলিয়র্ডস্ খেলায়, সন্ধ্যায় টেবিলে টেবিলে শীতল পানীয় বণ্টনও করে বেড়ায়। অশোক বিরক্ত চিত্তে ভাবছিলো, কর্তাকে বলতে হবে মার্কারকে অন্য কাজে আটকে না রাখেন। কর্তা কি উত্তর দেবেন তা সে জানতো—তিনজনের বেশি চাকর রাখবার উপযুক্ত আয় ক্লাবটির নেই।

বিলিয়র্ড-টেবিলের দূরতম কোণে লাল বল ও কাছের বাঁ-হাতি কোণে স্পটেড বলটা রেখে অশোক বক্ থেকে তিন কুশনের ধাক্কায় নিজের বলটা ঘুরিয়ে প্রায় অসম্ভব একটা ক্যানন করবার চেষ্টা করে

বোধ হয় বার কুড়ি অকৃতকার্য হয়ে পুনর্ব্বার চেষ্টা করবার জন্য কিউতে খড়ি ঘসছিলো। বেণী ট্রে-হাতে বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে তাকে মৃদুস্বরে আশা দিয়ে গেলো—অভি আয়া সাহব! অশোক আশান্বিত হয়ে বললে, জলদি করো, আর নিজেই গিয়ে স্কোর-বোর্ডটা শূন্য অঙ্কে ঠিক করে এলো। বেণীর সঙ্গে খেলাটা সত্যিই রোমাঞ্চকর। ইচ্ছে করে প্রভুদের কাছে না হারলে বেণীকে হারানো একরকম অসম্ভব কথা। কিন্তু সে কথাটা অন্য। বেণীর খেলাটাই আশ্চর্য, ভুল-চুক নেই, হিসেবের গরমিল নেই। সে একবার কিউ ধরলে লম্বা লম্বা ব্রেক ভিন্ন টেবিলটা যেন ছাড়তে চায় না। তবুও রেষারেষির খেলাতেও তাকে কোনোদিন জিততে না পারলেও অশোক বেণীর কাছাকাছি যেতো, বিশেষ কখনো লজ্জাকরভাবে হারতো না।

বেণীর আশায় অশোক ক্যানন ছেড়ে একটা বলকে সবেগে আঘাত করে চার কুশনে আটবার ধাক্কা দেবার চেষ্টা করছে, এমন সময়ে মার্কারের বদলে ঘরে ঢুকলো কাঞ্জিলাল। মুখের সিগারেটে শেষ-টান দিয়ে স্কোর-বোর্ডের নিচের তেপাইয়ের অ্যাশ-ট্রেতে টুকরোটা ফেলে দিয়ে সে অশোককে জিগগেস করলে, খেলবে নাকি একহাত আমার সঙ্গে? কাঞ্জিলাল যদিও মন্দ খেলত না তবু অশোকের তুলনায় তার খেলা কিছুই নয়। অশোক বেণী বা সমকক্ষ আর কারো আশা সে-সন্ধ্যায় ত্যাগ করছিলো, জবাব দিলে, আসুন তাহলে।

বিশেষ করে টেনিস আর বিলিয়র্ডসের জন্য অশোকের সঙ্গে কাঞ্জিলালের পরিচয় ছিলো, কিন্তু তখনো পর্যন্ত দুজনের ঘনিষ্ঠতা হবার

কানো কারণ ঘটেনি। কাঞ্জিলাল সঙ্গীতরসিক ব্যক্তি, তার বাড়িতে গানের বৈঠক হলে আর পাঁচজনের সঙ্গে সে কয়েকবার অশোককে নিমন্ত্রণ করেছিলো এই যা। কাঞ্জিলাল ব্যারিস্টর। ক্ষুদ্র হরদোই শহরে তার যে বৈশিষ্ট্য ছিলো, তা তার অ্যাডভোকেটকুলের মুকুটমনি হওয়ার জন্য নয়, কারণ সে অ্যাডভোকেটদের শীর্ষালঙ্কার হওয়া কেন, কোনো অলঙ্কারই ছিলো না। তাদের বৈশিষ্ট্য ছিলো বহুলভাবে মিসেস কাঞ্জিলালের কারণে। ত্রিশ বছর আগেকার বাঙালি সমাজে তিনি পর্দানশীন ছিলেন না। তাঁর বৈদগ্ধ, নানা কলারসিকতার খ্যাতি ছিলো। অশোক কাঞ্জিলালদের বাড়ি গেলে উপলব্ধি করতো সে বাড়ীটায় ইংরিজি ও পুরানো বনিয়াদি বাঙালি চালচলনের একটা চমৎকার সমন্বয় হয়েছে।

কাঞ্জিলাল প্রায় টেবিলের ওপর শুয়ে পড়ে স্পাইডরের সাহায্যে একটা ক্যানন করবার বৃথা চেষ্টা করলে। মিস্-কিউ হয়ে কুশনে শুধু খড়ির দাগ পড়া সার হোলো। দাঁড়িয়ে উঠে কপালের বড়ো বড়ো ফোঁটা ঘাম বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে মুছে ফেলে সে অশোককে জিগগেস করলে, কোথাও যাচ্চো নাকি অশোক? তোমার স্ত্রী কোথায় এখন? অশোক বয়সে অনেক ছোট, কাজেই এ সম্বোধনে আপত্তি করতো না।

ইন্-অফ করতে করতে অশোক উত্তর দিলে, স্ত্রী দেরাদুনে। যাবো মনে করছি দু-এক দিনের মধ্যে। আপনার যাবার কল্পনা আছে নাকি কোথাও? অবাক কথা! টেবিলের মাঝ-পকেটের কাছের অতো সহজ

ইন্-অফটা তার ফস্কে গেলো, যা সে বিলিয়র্ডস্ খেলা আরম্ভ করে পর্যন্ত কোনোদিন ফস্কায়নি। লাল বলটা পকেটের কাছে ছিলো ইন্-অফের উপযোগী কোণে, সেটাকে লক্ষ্য করতে গিয়ে অশোক দেখলে সেটা আর রঙিন বল নয়; মিনির ডিম্বাকৃতি ফরসা মুখ, কমনীয় ঢলঢলে দৃষ্টি তা থেকে ফুটে উঠেছে। মিনি কতোদিন গেছে তার মা-র কাছে—সেই জ্যানুয়রি মাসে! বাড়িতে চতুর্দিকে তার অতোগুলো ছবি থাকা সত্ত্বেও অশোক যেন মিনির মুখ ভুলে গিয়েছিলো। অন্তত বলের প্রতিবিম্বে দেখার মতো করে মিনির মুখ এতো সজীব হয়ে বহুকাল অশোকের চোখের সুমুখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেনি। তার ব্যায়ামপুষ্ট বিশাল দেহের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত মিনির বিদ্যুৎ-শিহরণে ভ্রমণ করে গেলো।

কাঞ্জিলাল হয়তো কিছু আন্দাজ করেছিলো, মৃদু হেসে বললে, স্টেডি, ইয়ং ম্যান, স্টেডি। স্ত্রীর কথাটি শোনবামাত্রই যে গলে গেলে হে! আজ আমি জিতবো। কাঞ্জিলাল প্রায় দশ মিনিট ধরে খেললে।

তারপর, বলছিলুম কি, দেরাদুন জায়গা কেমন? আমরা কখনো যাইনি ওখানে। এই গ্রীষ্মে ইউ-পির নাম শুনলেই অবিশ্বাস জন্মে যায়; সব জায়গাই সমান, গরমের আর অবধি নেই!

কেন, নাইনিতাল মুসৌরিও তো যুক্তপ্রদেশে!

সে তো পাহাড়, দেরাদুন তো ভ্যালি। না না, তোমরা কি যে বলো, উপ—উপত্যকা। অ্যাম আই রাইট! ইংরিজি কথায় তুমি আবার অপ্রসন্ন হও, ঠিক আমার স্ত্রী মন্দার মতো। তা যাকগে, জায়গাটার বর্ণনা দাও।

অশোক বললে, আমি ঠিক দেরাদূনে যাইনে। যেখানে যাই সেটা একটা গ্রাম, নাম চক্ষুওয়ালা। দেরাদূনের কাছাকাছি বটে। ওই উপত্যকারই অন্তর্গত গ্রামটা, চারদিকে পাহাড়। বরফ-গলা ঠাণ্ডা সেখানে না থাক, ঠাণ্ডা বলতে হবে; যদিও দিনে একটু গরম। রোদে পাথর তাতে, সেগুলো গ্রিণ্ট করে কিনা! গ্রামটায় আমার শ্বশুরমশায়ের বাগান আছে। তিনি অবসর নিয়ে ইদানীং ফলের ফার্মিং করতেন। শ্বশুর মারা যাবার পর থেকে শ্বাশুড়ীই সব দেখেন।

কি বলো, যাবো নাকি তোমার সঙ্গে? ভালো লাগবে?

আমার তো ভালোই লাগে। বেশ তো, চলুন না। অশোক আবার একটা ইন্-অফ ফস্কালো। কাঞ্জিলালের খেলায় বিশেষ মন নেই, সে সঙ্গীনের মতো করে কিউটা খাড়া করে ধরে গল্প করতে লাগলো। একটু পরে বললে, থাক হে আজ খেলা। চলো বাইরে গিয়ে গল্প করি। আচ্ছা, তার চেয়ে এক কাজ করো না কেন? আমার বাড়ি চলো বরং, তোমাদের দেরাদূনের গল্প শুনে একটু ঠাণ্ডা হওয়া যাক।

কাঞ্জিলালের বাড়ি ক্লাবের পাশেই। তারা ফটক ঘুরে সেখানে গেলো। ছোট একটু ঘাস-জমির ওপর কয়েকটা বেতের চেয়ার পাতা ছিলো। অশোক দেওয়ালের গায়ে বাইকটা ঠেস দিয়ে রেখে গিয়ে বসলো। কাঞ্জিলাল সেখান থেকেই ডাকলে, মন্দা, মন্দা। একটা চাকর ছুটে এলো, বললে, হুজুর, মেমসাব বাড়িতে নেই, বোধ করি শহরে কারো বাড়ি গেছেন!

অচ্ছা, সিগার কা বকস্ লাও, অওর—অশোক, হোয়াট উইল ইউ হ্যাভ ফর এ ড্রিঙ্ক ?

চা এক পেয়ালা।

পাগল নাকি! এই গরমে চা! সাহবকে লিয়ে পাইনঅ্যাপল, মেরে লিয়ে এক লেমন।

দুজনে আস্তে আস্তে কিয়াওরার শরবৎ পান করতে করতে গল্প করতে লাগলো। টেনিসে কাঞ্জিলালের সবিশেষ ঝোঁক ছিলো, অল্পক্ষণেই টেনিস এসে দেরাদূনকে চাপা দিলে। এক সময়ে কাঞ্জিলাল জিগগেস করলে, আচ্ছা অশোক, তুমি এক সঙ্গে এতোগুলো আয়ত্ত করলে কি করে ? টেনিস ফুটবল বক্সিং কুস্তি বারবেল সাহিত্য, অ্যাণ্ড অন দি টপ অফ অল ছাট, একটি বউ, শক্ত কথা বটে! অশোক তার প্রশ্নের ধরনে হো হো করে হেসে উঠলো, বললে, কি জানি, ওগুলো আমার রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে গেছে, দূরে থাকতে পারিনে। কিন্তু আনন্দ পাওয়া ছাড়া কোনোটাতে বিশেষ এগিয়ে যেতে তো পারলুম না।

ওপাশে চাকরেরা মিলে মাঠেই খানা-টেবিল ঠিক করছিলো, তা দেখে অশোক উঠে পড়ে বললে, আজ আসি।

যাবে ? তার চেয়ে এক কাজ করো না, পট-লাক খেয়ে যাও। মন্দাও এখনি এসে পড়বে।

না, না, আজ থাক, একদিন খেলেই হবে।

যাবে তাহলে ? দেরাদূন যাচ্ছো কবে ?

অশোক একটু ভেবে নিয়ে বললে, কাল, মেলে।

অশোকের আলোহীন বাইক অন্ধকার পথ দিয়ে তীর বেগে ছুটলো।

কাল—তারপর পরশু সকাল থেকে তুমি আর আমি—দাউ অ্যাণ্ড আই বিনীথ দি বাউ। না না, ইন দি উইসটারিয়া বাওয়ার। নেবু ফুলের গন্ধ, মত্ত লুব্ধ ভ্রমর, প্রলুব্ধ আমি! অশোক ভাবতে লাগলো, মিনি মিনি মিনি। দেরাদূনে আর কেউ নেই, পৃথিবীতেও যেন আর কেউ নেই মিনি ছাড়া।

এই মিনি মেয়েটিই অশোককে মাটি করেছে। মিনি স্বরূপা কিন্তু তাকে সুন্দরী বলা যায় না। তার মনে কি আছে তা জেনে আমাদের কাজ নেই। সে অশোককে মুগ্ধ বিমোহিত করে রেখেছে। বর্ণনাটা ঠিক হোলো না, অশোকই নিজেকে মোহমুগ্ধ করেছে মিনিকে দিয়ে। নিজের মনেই সে ভাঙে গড়ে, মিনি তার প্রেমের ঝাঁপিতে কি গোপন দান দিলে বা না দিলে অশোক তার তোয়াক্কা রাখে না, নিজের বিপুল আবেগ নিয়েই সে ভরপুর।

অশোকের বাবা হরিহর প্রসাদ সরকারী উকিল; ধনী নয় কিন্তু যথেষ্ট সচ্ছল অবস্থার মানুষ। অশোক জন্মেছিলো কেবল যেন খেলবার জন্য। অত্যন্ত চতুর মেধাবী হলেও তার লেখাপড়ায় মন ছিলো আংশিক ভাবে। আংশিক ভাবে বলতে হোলো তার কারণ সব বিষয়ে তার মন লাগতো না, যাতে মন লাগতো তাও সে শিখতো খেলার ফাঁকে ফাঁকে। কাজেই তার খেলার কুশলতা যেমন হোলো, দেহ যেমন নয়নানন্দরূপে গড়ে উঠলো, অপরিমিত শক্তি যেমন সঞ্চিত হোলো, সে হিসাবে তার লেখাপড়া হোলো না, হয়ও না বোধ করি কোনো অজ্ঞাত প্রাকৃতিক

নিয়মে। বিশ্ববিদ্যালয় অশোককে ফালতু খাতায় ফেলে রাখলে বটে, কিন্তু ভবঘুরে বৃত্তির পৃথিবীজোড়া যে বিরাট বিশ্ববিদ্যালয় আছে যেখানে ইন্দ্রিয় দিয়ে জ্ঞান আপনি কুড়িয়ে নিয়ে হৃদয়ঙ্গম করতে হয় অশোক সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকস ছাত্র। কলেজের ইংরাজ অধ্যাপকেরা তার খেলা আর কুড়ানো জ্ঞানের জন্য অশোকের ওপর প্রসন্ন ছিলো। একজন যুবক অধ্যাপক তো তাকে আপন-জন ভেবে নিত্য সিগারেট আর খেলা-শেষে বিয়র খাওয়া শেখাবার প্রয়াস পেতো। দেশি মাস্টারেরা অশোকের ওপর প্রসন্ন ছিলেন না। পণ্ডিতমশায় তো তাকে প্রায়ই বলতেন, তুই আর রঘুবংশে মন দিয়ে কি করবি বাবা! দেবভাষা তোর মুখ দিয়ে বেরোবে না। তুই আমার ক্লাশে চাকার-আউট হয়ে থাক।

ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাশে পড়বার কালে অশোকের মিনির সঙ্গে বিবাহ হোলো। নববধূ যখন ঘর করতে এলো তখন তার গ্রীষ্মের ছুটি। অশোক মিনিতে মেতে গেলো। বাড়ির লাইব্রেরিতে সে মাঝে মাঝে বৈষ্ণব-পদাবলী নাড়াচাড়া করেছিলো। দৃষ্টিপথ দিয়ে তার হৃদয় আটকে গিয়েছিলো টুকরো টুকরো শব্দে, বাক্যে—তাতে নিহিত অনন্ত মাধুর্যে। অমিয়সাগরে স্নান নয়, মিনিকে পেয়ে অশোক অমিয়সাগরের অতলান্ত বারিধিতে নিমজ্জিত হয়ে গেলো। বাইরে মিনি হোলো অশোকের রক্ষাকবচ, অন্তরে স্নিগ্ধ আলো।

বি. এ. পড়তে অশোক লক্ষ্ণৌ ফিরে গিয়েছিলো। রক্তে মিনি, হৃদস্পন্দনে মিনি, বইয়ের পাতায়, ফুটবলের গায়ে মিনি। কুস্তির ওস্তাদের আক্রমণে মিনির আলিঙ্গনের আভাস। হরদোই লক্ষ্ণৌ কাছাকাছি। মিনির দেহের

বিশিষ্ট সুবাস যেন অশোকের হস্টেলের নির্জন কামরায় অনুক্ষণ হানা তো। সে ছুতোয় নাতায় বাড়ি গিয়ে আর সময়ে এসে উঠতে পারতো। একদিন বাড়ি গিয়ে সে আর কলেজে ফিরে যাবার মতো বল খুঁজে পেলে না। মিনি তখন অষ্টাদশী, তার দেহে অব্যক্ত কী যেন উছলে, নয়নে মদালস দৃষ্টি। অশোক আটকে গেলো। মিনি ওর সর্বনাশী মায়া। অথচ মিনি তাকে একদিনও বলেনি—থাকো, কি যাও। অশোক জের মনের মাধুরী দিয়ে মিনিকে নিজের নিয়তি করে তুললে। সে সম্পূর্ণভাবে এই নিয়তি-নির্ভর হোলো।

এ-কথাও সত্য যে অশোকের উগ্র পুরুষপ্রকৃতি মিনিকে বস্ত্রের মতো জড়িয়ে রইলো না। মন্দিরে বিশ্বনাথ চিরবর্তমান আছেন জেনে উপাসক যেমন নিজের মনের একটি খুঁট সেখানে নিবদ্ধ রেখে নিজের বাহ্যিক কাজ করে যায়, তেমনি মিনি এ-ঘরে ও-ঘরে বর্তমান আছে জেনে চিত্তের কাঙ্ক্ষা-কোষটি তৃপ্তিতে পূর্ণ করে রেখে অশোক নিজের নেশায় মত্ত থাকতো—খেলার ব্যায়ামের নেশা, পড়ার, হৃদয়গ্রাহী বিষয়কে আপনার করবার মধুকরবৃত্তির নেশা। অশোকের দেহমনের বিশ্রাম, সম্প্রসারণ সম্ভোগের কালে রইলো মিনি, ক্রিয়ার সঙ্কুচিত নিবিষ্টতায় রইলো সম্পূর্ণভাবে নিজের। কিন্তু মিনি চলে গেলে তার এই শৃঙ্খলা ভেঙে যেতো; নিক্ষিপ্ত পারার অণুপরমাণুর মতো অশোকের সবকিছু বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়তো।

পাঁচটি মাস নয় যেন পাঁচটি কল্প। এই কল্পকাল মিনিকে হারিয়ে থেকে অশোক আবার মিনির কণ্ঠস্বর, দেহভঙ্গীতে নূতন রহস্য, নূতনতর স্বাদ

খুঁজে পেলে। নির্জন ঘুঘু-ডাকা দ্বিপ্রহরে বাদাম গাছের তলায় মিনি অশোকের গায়ে ঠেস দিয়ে বসতো, মুখে মিষ্টি হাসি, দৃষ্টি সমুজ্জল। তবুও মিনি মুখ দিয়ে বলতো না, এস, কি যাও। তার কোমল পুষ্ট দেহের মধুর চাপে অশোকের অন্তরে নানা বাণীর ঢেউ পাঠিয়ে দিতো।

দিন পনেরো পরে প্রমোদ কাঞ্জিলালের চিঠি এলো, অশোকের ভয়ে কষ্টে-স্বষ্টে লেখা বাংলা চিঠি—যদি বাড়ি ঠিক করতে পারো, আমরা যাবো।

বাগানের অন্য প্রান্তে একটা ছোটো বাড়ি ছিলো, এদেশে যাকে বলে বাঙালিয়া—বাংলা-বাড়ির ছোট একটা সংস্করণ। শাশুড়ীকে বলে অশোক বাড়িটা ঝাড়পোঁছ করিয়ে এ-বাড়ি থেকে কিছু প্রয়োজনীয় আসবাব দিয়ে সাজিয়ে কাঞ্জিলালকে তার করলে। তাদের আসার নির্দিষ্ট দিনে অশোক মিনিকে সঙ্গী হতে সম্মত না করতে পেরে একা লক্সর গেলো অতিথিদের প্রত্যুদ্গমন করতে।

ক্যালকাটা মেল এলো রাত সাড়ে তিনটেয়। কাঞ্জিলাল নামলো, তাদের ঘুমন্ত বেবি নামলো বেয়ারার কোলে। জানালা দিয়ে দেখা গেলো এক মহিলা পিছন ফিরে বাক্স বাণ্ডিল গুনছেন, তাঁর ঊর্ধাঙ্গ জানলার আড়ালে দেখা যাচ্ছে না। কাঞ্জিলাল বেয়ারা ও কয়েকটা কুলি সঙ্গে করে প্ল্যাটফর্মের ওপারে দেরাদূনের গাড়িটার দিকে চলে গেলো। অশোক লাফিয়ে গাড়িতে উঠে মহিলাটিকে একটা ছোট বাক্স নিয়ে টানাটানি করতে দেখে বললে, থাক বৌদি, আমি নামিয়ে নিচ্ছি। মন্দা ফিরে দাঁড়ালো। তার আয়ত চোখের দৃষ্টি পড়লো অশোকের মুখের ওপর অশোক দৃষ্টি নামিয়ে নিয়ে যেন নিজের অজ্ঞাতসারে বীজমন্ত্র জপ করে

উঠলো—মিনি মিন্টি মিনু মিনা। জিনিসপত্র নেমে গেলো, ওরাও নামলো। অশোক আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, ওই ওপারে গাড়ি, আসুন। পৃথিবীর হাওয়াটা যেন প্রশ্নে ভরা! ওপারে যেতে-যেতে স্বতঃই অশোকের মনে প্রশ্ন জাগলো—নবদূর্বার মতো সুচিক্কণ শ্যামা, না, মিনির মতো গৌরী, কোনটি ভালো? তার পিছনে পিছনে আসছিলো অপরাভূত শ্যামশ্রী।

মেল চলে যেতেই স্টেশনের অধিকাংশ আলো নিভে গেলো। মেঘ-মেদুর, অন্ধকার আকাশ, সজল হাওয়া; অশোকের শীত-শীত করতে লাগলো। কাঞ্জিলাল হঠাৎ বললে, মন্দা চা খাবে? অশোক চা খাবে?

অশোক বললে, আপনি বসুন। আমি ব্যবস্থা করছি।

না, তুমি বোসো। আমার ভারি প্লেসেণ্ট লাগছে ঘুরে বেড়াতে অ্যাণ্ড আই ওয়ণ্ট এ স্ট্রেঙ্গার ড্রিঙ্ক। সে চলে গেলো কেল্‌নারের উদ্দেশ্যে।

পরস্পরের পরিচয় নেই, কথার খেই নেই। সামনা-সামনি বসে অশোকের কুণ্ঠা বোধ হতে লাগলো। অকারণে সে রেলের টিকিটটা বার করে তার প্রত্যেকটি অক্ষর-শব্দ পড়লে। চোখ তুলে দেখলে মন্দার দৃষ্টি তার ওপর নিবদ্ধ। কুক্ষণে অশোক পাঞ্জাবি পরে এসেছিলো; স্কন্ধের স্ফীতি কবাট-বক্ষের প্রসারতা তাতে ঢাকা পড়ে না, বড়ো লজ্জা দেয়। দেহটাও তার যেন অকারণ দীর্ঘ। সে দুহাত বুকের কাছে জড়ো করে হাতের পাতা নিয়ে উন্নত কাঁধ দুটো ঢাকা দিল।

আপনার শীত করছে বুঝি অশোকবাবু? একটা গায়ের কাপড় দেবো?

তা একটু করছে বই কি!

মন্দা মাঝের আসনের পিঠের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে একটা মেয়েলি র‍্যাপ দিলে। অশোক সেটা হাতে নিয়ে ইতস্তত করছে দেখে সে কলকণ্ঠে হেসে উঠে জিগগেস করলে, লজ্জা করছে বুঝি ? কিন্তু বাইরেও যে আর কিছু নেই। শীতে কাঁপার চেয়ে ওই ভালো। ওটার, আর লজ্জার উষ্ণতা দুটো দিয়ে আরামই পাবেন। আচ্ছা, মিনি বুঝি তার নাম ? সে কি খুব ছোট এতোটুকুটি ? আপনার মিনি খুব লোভনীয় নিশ্চয়ই, নয় ? নামটি বেশ মিষ্টি ; মনে হয় মানুষটিকে দুহাতে টুক করে তুলে নেওয়া যায় ; নয় ? মিনি যারা তারা কি উর্বশীর মতো ? বদলায় না, বড়ো হয় না !—মন্দা মুখে আঁচল দিলে।

প্রমোদ এসে অশোককে কুণ্ঠা থেকে বাঁচালে। অবশেষে ভোরের বেলা গাড়ি চলতে আরম্ভ করতে অশোককে র‍্যাপটি গায়ে দিতেই হোলো !

দেরাদুনে এসে মন্দা বয়েলগাড়ি দেখে অবাক হয়ে গেলো। ও অশোক-বাবু, শেষে গরুরগাড়ি চড়াবেন নাকি ? ভারি কিন্তু মজার, চড়িনি কখনো। বাঁচবো তো চড়লে ? মন্দার চার বছরের ছেলে রঞ্জন বৃহদাকার বলদ দুটি দেখে আনন্দকলরব করে উঠলো।

অশোক উত্তর দিলে, বাঁচবেন বৈকি। বলদ বলে ওদের তাচ্ছিল্য করবেন না। হরিয়ানি বলদ, গাড়িতে চড়লে বুঝবেন আপনাদের পক্ষীরাজদের ওরা অবলীলায় হার মানায়। আর অবজ্ঞা করলে আমার শাশুড়ীকে লজ্জা দেওয়া হবে। গাড়িটা তাঁর বাগানের কিনা ! বলদগুলো কুয়ো থেকে জল টানে, গাড়ি বয়। যেতেও হবে ফরেস্ট কলেজ ছাড়িয়ে দশ মাইল, সেখানে অন্য গাড়ি যায় না।

রিয়ানি বলদজোড়াটি শিঙ নেড়ে তাদের বৃহৎ শুভ্র সুচিক্কণ দেহের থলথলে পেশী আন্দোলিত করে যেন চক্ষের নিমেষে শহরের সীমানা পার হয়ে গেলো। সকালের স্নিগ্ধ স্বর্ণাভ রোদে ঘনসবুজে ঢাকা প্রদেশটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। ওপরের দিকে মুসৌরির ঘন নীল পর্বতশ্রেণী। মন্দা গাড়ির জানলায় বসে ভূপ্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় করছিলো, তার শ্যামল মুখে সোনালি রোদ, দৃষ্টিতে তৃপ্তি। অশোকের দিকে চেয়ে সহসা বলে উঠলো, অশোকবাবু হাঁটবেন একটু? ওগো, তুমি হাঁটবে নাকি, না, পিঁজরেয় বসে থাকবে?

প্রমোদ জানলায় ঠেস দিয়ে কি একটা বই পড়তে আরম্ভ করেছিলো, মুখ তুলে বললে, নট মি! তার চশমার কাঁচ চিকচিকিয়ে উঠলো।

মমি হম যায়েঙ্গে। ছেলে মাকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে সমুখ দিকে দেহ ঝুঁকিয়ে দুহাত বাড়িয়ে দিলে।

না না রঞ্জু, কচি পায়ে ব্যথা লাগবে তোমার, ডার্লিং। মন্দা মুখ বাড়িয়ে তার মুখে চুমো খেলে। শিশু খুশি হয়ে চলমান গাড়ি থেকে ক্ষুদ্র হাতটি নেড়ে বললে, বাই-বাই।

অশোক প্রগল্‌ভতা লক্ষ্য করেছিলো, এখন তার স্ফূর্তি ও প্রাণশক্তি দেখে আশ্চর্য হোলো; কিন্তু জিগগেস করলে অন্য কথা, রঞ্জুকে হিন্দি শিখিয়েছেন কেন?

আমি তো শেখাইনি! আয়া আর বেয়ারা ওর সঙ্গী, তারাই শিখিয়েছে ওকে। মুখ তুলে মৃদু হেসে আবার বললে, ফিরিঙ্গি সাহেবিয়ানার চেয়ে হিন্দি ঢের ভালো, নয় কি?



অশোক আত্মীয়া ছাড়া আর কোনো মহিলার সঙ্গে কোনো দিন আলাপ করেনি। সে যুগটাতেই সহজে এই রকম কোনো অবসর মিলতো না। রেলে বসে সে উপলব্ধি করেছিলো তার মনে অনেক সঙ্কোচ লজ্জা লুকিয়ে আছে। মন্দা অবস্থাটা অনেক সহজ করে দিয়েছিলো। অশোক তার কথা শুনতে শুনতে এক-এক সময়ে ভাবছিলো, এ কি প্রগল্‌ভতা, না অগ্রবর্তী সমাজের মেয়েদের ধরনই ওই! মিনি এখনো ঘোমটা দেয়, তার উচ্চ কণ্ঠ বাড়ির কেউ আজ পর্যন্ত শোনেনি।

দিনের বেলা সে মন্দাদের পরিচয় দিচ্ছিলো মিনিকে, মানুষ ওঁরা ভালোই। সাহেবিয়ানা কিছু থাকলেও এমন উৎকট কিছু নয়। মিসেসের চালচলন ভালোও লাগে, আবার আমার অনভ্যস্ত মনকে ধাক্কাও দেয় নিঃসঙ্কোচ তো বটেই উনি, আবার মনে হয় যেন আক্রমণক। হয়তো ও-ধরন জানিনে বুঝিনে বলেই ওরকম মনে হয়েছিলো। চলো, বিকেলে যাই, চাক্ষুষ পরিচয় করে আসবে। আর যাই হোক, আমাদের দিনের বাদামতলাটা মারা গেলো। ও ধারের বরাশ গাছের গোড়ায় আস্তানা করতে হবে দেখছি, তুমি কি বলো?

সে যাহোক হবে, আমি কিন্তু যেতে পারবো না বাপু। আমি গেঁয়ো, সেই পুরানো পারবতীয়া, মিনিতে বদলে নিয়েছো বলে সত্যই তো

ার আমি বদলে যাইনি! তোমার মেমসাহেবই আগে আসুন না, ।কটু বুঝেশুঝে নিই। হঠাৎ ডুবজলে গিয়ে হাবুডুবু খাওয়ার চেয়ে ারা বুঝে জলে নামা ভালো।

শোক মিনিকে সহসা জড়িয়ে ধরে বললে, তা নেমো বুঝেশুঝে। তী ঠাকরুণ, এই চক্ষুওয়ালা গ্রামে জন্মেছো বলে গেঁয়ো তুমি নও গো! ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণ-ধারিণী, বাণী বরাভয়দায়িনী—আমার মুখ াটালো, বুক ফাটালো সে কি শাদা-মাটা পাহাড়ি মেয়ে?

াঃ, কি করো, ছাড়ো। ওই শোনো মা-র গলার স্বর এদিকে গিয়ে আসছে।

নে আলাদা হয়ে দাঁড়াতেই কাত্যায়িণী ঘরে এলেন, মিনি মাথার কাপড় টেনে চলে গেলো। কাত্যায়িণী জিগগেস করলেন, তোমার বন্ধুদের কোনো অসুবিধে হয়নি তো অশোক? ভাবছি মিনিকে নিয়ে একবার ঘুরে আসি ও-বাড়ি।

মিনি বলছেন ওঁর ভয় করছে। অশোক মৃদু হাসলে।

মিনির আবার ভয়। মিনি ও মিনি, কোথা গেলি আবার! তিনি দরজার পানে এগুলেন। মিনি নিঃশব্দ চরণে এসে দাঁড়ালো।

ঘোমটার ফাঁকে তার একটি চক্ষু দেখা যাচ্ছিলো। অশোক ভাবলে, শাশুড়ী সম্প্রদায়ের বিবেচনায় যেন চুক আছে। আজ বুঝি আর বরাশ তলায় নীড় বাঁধা হোলো না। অশোক কল্পনা করছিলো পাশাপাশি দুটো হ্যামক টাঙাবার, যা চিত্তদোলায় দোলে, বিপরীত দোলায় এ-ওকে ধাক্কা দিয়ে যায়। জাল-জড়ানো দুটি দেহের দৃঢ় যেটি সেটি নিমেষের জন্য

কোমল অন্য দেহটিতে চাপ দিয়ে ফিরে আসে। গাছের কপোতদম্পতি যা দেখে হিংসায় আকুল হয়ে ওঠে তারা মানুষ নয় বলে, মানুষের গড়া শিহরণ জাগানো উপকরণ থেকে বঞ্চিত বলে। মাথা চুলকে সে বললে, মা এখনি যাবেন ? ওরা হয়তো বিশ্রাম করছেন এখন। তাছাড়া জানিনে ওরা দুপুরবেলা অতিথি আসা ভালোবাসেন কি না! মিনির একটি চক্ষু উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

শাশুড়ী উত্তর দিলেন, তাহলে রোদ পড়লে যাবো, তাই ভালো।

কপোতদম্পতি জানে সে দ্বিপ্রহরের হ্যামকের কাহিনী, আমরা জানিনে। আমরা কেবল তাদের চঞ্চুপুটের আগ্রহান্বিত খেলা দেখেছি। এও জানি না সে-খেলা মানুষের নকলে, না ওদেরই সহজাত সংস্কারের।

বিকেলে অশোক বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিলো, মিনি সামনের একটা চেয়ারের পিঠ ধরে দাঁড়িয়ে যাই-যাই করেও নিজেকে সেখানে আটকে রেখেছিলো। কাত্যায়িণী ও-বাড়ির পথ থেকে দেখতে পেয়ে বারান্দায় উঠলেন। মিনি সোজা হয়ে দাঁড়ালো। কাত্যায়িণী বললেন, তোমার বন্ধুর বাড়ি ঘুরে এলুম, বাবা। খাসা মেয়ে মন্দা। আর কি আশ্চর্য রূপ রে মিনি! কালো না হলে যেন ও রূপে খাপ খেতো না। দেখতে দেখতে ভাবছিলুম, এই সত্যি বাঙালির মেয়ে। মন্দা একদিন আসবেন বললেন

তিনি চলে যেতেই মিনি অশোকের দিকে চেয়ে মুচকি হাসলে।

হাসলে যে ?

বা রে, হাসতে নেই ?

না, বলো, কেন হাসলে। মনে হচ্ছে ও হাসির অনেক মানে।

মানে নেই গো, অকারণ হাসি । মানে থাকলে এখন থেকেই আমার কাঁদতে বসা উচিত ছিলো পা ছড়িয়ে। তবুও মিনি যেন ইঙ্গিত জানিয়ে গেলো। মোটা-বুদ্ধি অশোক—সে ইঙ্গিতের ধার দিয়েও গেলো না ।

কাঞ্জিলালদের আগমনের আগের দিন পর্যন্ত সকালবেলাটা অশোক ব্যায়ামচর্চার পর শ্বশুরের পুরানো বই ঘাঁটতো, তার টুকরো-টাকরা পাঠ চলতো সেই ঘাঁটার মাঝে। কখনো কখনো কোনো বইতে তার মন লেগে তার স্নানাহারের বেলা হয়ে যেতো । মিনি সংসার থেকে ছুটি পেলে সেখানে ঘুরে যেতো, পাঠমগ্ন স্বামীর ধ্যান ভাঙাতো না, কেবল ভূষণশিঞ্জনে ইঙ্গিত জানিয়ে যেতো নিজের অস্তিত্বের, নিজের অখণ্ড অবসরের। কিন্তু মন্দারা আসবার পর অশোকের পাঠচর্চা উঠে গেলো। প্রভাতে উঠেই সে ও-বাড়ি যেতো অতিথিদের খবর নিতে । প্রথমটা সত্যই খবর নেবার তার তাগিদ ছিলো, কোনো অসুবিধা হচ্ছে কি না, কিছুর অভাব হয়েছে কি না। অশোক নিজেকে তাদের সুখসুবিধার জন্য গুরুতরভাবে দায়ি মনে করতো। পাঁচ দিনে এমন দাঁড়ালো যে বাড়িতে অশোকের চা খাবার পাট উঠে গেলো। সে কাজটা তার মন্দার বাড়িতেই সমাপন হতে থাকলো। মিনি চা-তে অনুরক্ত ছিলো না, কতকটা অশোককে সঙ্গ দেবার জন্য চা খেতো। সে আপন মনে মুচকি হেসে চায়ের ব্যপারটা তুলে দিলে। কিন্তু কাত্যায়িনীকে জানতে দিলে না সে কথা । তাদের এ দাম্পত্য অভ্যাসটি ভেঙে দেবার কারুণ্যের কথা অশোকের একবার মনেও পড়লো না।

এ কয়দিন অশোক মিনিকে মন্দার কাছে নিয়ে গিয়ে আলাপ করিয়ে

দেবার কথাটা ভাবেনি। মিনি তাকে নিজের মনের কথাটা জানিয়েছিলো। অশোকের বোধ করি নিজের মনে সঙ্কোচ ছিলো, মন্দার কাছে নিয়ে গিয়ে এতোটুকু মিনিকে যেন দাঁড় করানো যায় না। বাড়িতে মিনির যে দীপ্তিটুকু ছিলো মন্দার প্রখর দীপ্তির কাছে সেটুকু কিছু নয়, মিনি তার সামনে যেন নিষ্প্রভ হয়ে এতোটুকু হয়ে যাবে। কোনো কিছু ভেবে দেখা বা তলিয়ে দেখা অশোকের ধর্ম নয়, এক আঘাত-অমর্যাদার বিষয় ছাড়া। ওদের অতিথি হয়েও যে মন্দা-মিনির আলাপ না হওয়াটা বিসদৃশ হতে পারে এ-কথা অশোকের মনের ধার দিয়েও যায়নি। তার নিজের কিন্তু তখন মন্দার সঙ্গে বৌদিদি সম্বন্ধ পাকা হয়ে গেছে, তার মনের স্বাভাবিক সঙ্কোচ ও লজ্জাজড়ো জিভ-জড়ানে ভাবটা আর নেই।

মনে হতে পারে মন্দা নাক-উঁচু আত্মাভিমানবিলাসী স্নব, মিনিদের সে অপাঙক্তেয় বলে ভেবে রেখেছিলো, কিন্তু তা নয়। বাড়িতে পদার্পণ করবার ক্ষণ থেকে মন্দা কোমরে আঁচল জড়িয়ে সেই যে ঝাড়পোঁচ আরম্ভ করেছিলো তারপর রাত্রিটুকু ছাড়া সে সপ্তাহভোর বিশ্রামের মুখ দেখেনি। সে নিরলস গৃহিণী, দেখতে দেখতে নানা অসুবিধার মাঝেও তাদের বাঙালিয়াটা ঝরঝরে ফিটফাট হয়ে উঠলো। কাত্যায়িণী তার ভাঁড়ার দেখে একদিন চমকে উঠেছিলেন, যেন স্থায়ী গৃহস্থের অনেক কালের সাজানো-গোছানো ভাঁড়ার, তাতে মাত্র সাতটি দিনের প্রয়াসের একবিন্দু ছাপ ছিলো না কোথাও। অশোক মন্দাকে প্রত্যহ রাঁধুনী সঙ্গে রাঁধতে দেখতো। মন্দা হেসে বলতো, রান্না আমার পরমাগ্রহের বিষয় অশোকবাবু। যদি কোনো দিন বই লিখি আমি তাহলে রান্নার

বইই লিখব। বিপ্রদাস মুখুয্যের পাকপ্রণালীর অর্থাৎ পুরুষের অনধিকার-চর্চার অহঙ্কার একেবারে ভেঙে দেবো।

কাত্যায়িনী তারপর নিত্য আসতেন। মন্দার তাঁর বাড়ি না-যাওয়াটাকে তিনি অসৌজন্য বলে ভাবতেন না। মন্দা তাঁকে জয় করে নিয়েছিলো, তিনি অতিশয়োক্তির যে পঞ্চমুখে সুখ্যাতি করার কথা আছে, মন্দার বিষয়ে তাই করতেন।

একদিন, প্রায় দিন দশেক পরে, মন্দা বললে, চলুন অশোকবাবু, এবার ঝাড়া হাত-পা হয়েছি, গুছিয়ে নিয়েছি। আপনার বহুবিখ্যাত মিনিকে দেখে আসি। তার অনেক নির্বাক নালিশ আর গালাগালির বাণ এ কয়দিন ক্রমাগত আমার হৃদয় বিদ্ধ করছে।

পুষ্পিত মধুমালতীলতায় ছাওয়া একটা জানলার গরাদ দুহাতে ধরে মিনি দাঁড়িয়েছিলো মুসৌরির পানে চেয়ে, মুখের ওপর তার স্বর্ণাভ রোদ। মন্দার উচ্চহাসি শুনে সে তাদের দিকে চেয়ে দেখে জানলা থেকে সরে গেলো। পথ থেকে অশোক তাকে দেখতে পেয়েছিলো, মন্দা পায়নি। অশোকের চৈতন্য হোলো মিনি সকালের আলুথালু ঘরানা সাজে সজ্জিত, মন্দার চোখের সামনে হাজির করবার মতো হয়ে নেই হয়তো।

বসবার ঘরে ঢুকে অশোক বললে, আপনি দয়া করে একটু বসুন বৌদি, আমি মিনিকে খুঁজে আনি।

মন্দা দীপ্ত চোখে কটাক্ষ করে উত্তর দিলে, ইস্, আমি যেন কনে দেখতে এসেছি! আপনার মিনির 'পত্রলেখায় কারুকাজ' না হলেও আমার চলবে আর সাজিয়ে গুছিয়ে আনতে হবে না তাকে। কোন দরজা ভেতরে

যাবার? মন্দা নিজেই পর্দা তুলে একটা ঘরে ঢুকে পড়লো। ঘরটা অশোকদের শোবার ঘর। মিনি খাটের বাজু ধরে দাঁড়িয়ে।

দুজনের চক্ষের পরিচয় হবারও অবসর হোলো না বুঝি। মন্দা দ্রুতপদে এগিয়ে গিয়ে মিনিকে সুদৃঢ় আলিঙ্গনে বেঁধে ফেললে, রাগ করেছিস জানি কিন্তু গোছগাছ করবার অফুরন্ত কাজ ছিলো ভাই হাতে, তাই আসতে পারিনি। বল্ আর রাগ নেই। মন্দা সশব্দে মিনির দুই গালে চুমো খেলে। মিনি রক্তবর্ণ হয়ে উঠলো। অশোক দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলো। তার দেহের সবটা শোণিত মাথায় একত্র হোলো যেন, তার গাল দুটো শিরশির করে উঠলো।

মন্দা মিনিকে আলিঙ্গনমুক্ত করে খাটে বসে তাকে কাছে টেনে নিয়ে অশোককে বললে, বোকার মতো হাঁ করে দেখছেন কি? পালান এখান থেকে। দুটি সখির বিশ্রম্ভালাপ শোনবার ভাগ্য আপনার হচ্ছে না গো ঠাকুর! আপনি কোথাও গিয়ে 'পুরুষের খেদ' আবৃত্তি করুনগে। জানেন সেটা, না জানেন না? মন্দা কলস্বরে হেসে উঠলো।

বাইরের বারান্দা থেকে অশোক ক্ষণে ক্ষণে দুজনের উচ্ছ্বসিত হাসি কলকণ্ঠ শুনতে লাগলো।

সকালবেলা মন্দাদের বাড়ি অশোকের চা-পানটা ছিলো নিত্য, তার জন্য কোনো নিমন্ত্রণের দরকার ছিলো না, কিন্তু বিকালে মন্দা প্রায়ই অশোককে চায়ের নিমন্ত্রণ করতো। অশোক কিন্তু লক্ষ করতো না যে মিনির সঙ্গে মন্দার যথেষ্ট হৃদ্যতা জন্মালেও কোনোদি

ন্দা তাকে ডাকেনি! মিনি এমনিই দু-একবার মন্দাদের বাড়ি ঘুরে গিয়েছিলো, প্রমোদকে দেখে একহাত ঘোমটাও টেনেছিলো। এই বৈকালিক বৈঠকে প্রমোদও কিন্তু বেশিক্ষণ বসতো না, খাওয়া নিজের খেয়াল মতো শেষ করে সে গ্রাম্য-পথে বেড়াতে চলে যেতো

একদিন প্রমোদ বললে, তুমি আমাকে আশ্চর্য করেছো মন্দা। আমি ানাড়ি তা সত্ত্বেও তুমি আমাকে তোমাদের সাহিত্য বোঝাবার চেষ্টা রেছো নিত্য। অথচ অশোককে সাহিত্যরসিক জেনেও তোমার খ খুললো না। ফাঁকি ধরা পড়ার ভয় পেয়েছো নাকি, ডিয়র? প্রমোদ নিজেই হাসলো নিজের কথায়

মন্দাও হাসলো, উত্তর দিলে, তুমি কি বোকা গো! সাহিত্য বুঝি কোমর বেঁধে তোড়জোড় করে তর্ক করতে ছুটে আসে? আলোচনা আপনিই আসবে যেদিন আসবার! তোমার অপেক্ষাও করবে না, অশোক-বাবুকেও তৈরী হয়ে বুদ্ধি শানিয়ে রাখবার সময় দেবে না। কি বলেন অশোকবাবু?

সেইদিনই সন্ধ্যায় প্রমোদ বেড়িয়ে এসে আরাম-কেদারায় শুয়ে পড়ে আলবোলার দীর্ঘ নলে টান দিতে দিতে বললে, অশোক, এখানে এসে তো ভেজিটেব্‌ল্ হয়ে গেলুম। হোয়াট এবাউট এ লিট্‌ল্ টেনিস অর্ ব্যাডমিণ্টন? একটু ব্যবস্থা করতে পারো না? তোমাদের নানা কিছু আছে, আই হ্যাভ নো ইণ্টরেস্ট ইন্ দেম।

তা হতে পারবে না কেন! ব্যাডমিণ্টন দিয়ে আরম্ভ হতে পারে কালই। টেনিসের ব্যবস্থার তো একটু সময় লাগবে।

বেশ। তোমার তো ব্যাডমিণ্টন চলবে মন্দা। টেনিসটাও শিখে নাও এখানে। অশোক ইজ এ মারভেলস প্লেয়র।

মন্দা অশোকের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বললে, তা পারি খেলতে যদি মিনিও এসে যোগ দেয়।

অশোক মাথা দুলিয়ে বললে, তা হবে না বোধ হয়। লজ্জাই মিনির ভূষণ। আচ্ছা দেখবো জিগগেস করে।

খানিক পরে মন্দা উঠে গেলো রান্নাঘরে। প্রমোদ আর অশোক টেনিসের আলোচনায় মেতে উঠলো। সকলেই দেখেছিলো সন্ধ্যার পূর্ব থেকে পশ্চিম গগনে একখণ্ড মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তারপর কেউ লক্ষ্য করেনি যে সেই মেঘ বিস্তৃত হয়ে নক্ষত্রগুলোকে ঢাকা দিয়েছে। দেখতে দেখতে তীব্র বাতাস উঠলো, সে-বাতাসের মুখে ছুটলো ধুলো, উড়লো ঝরা শুকনো পাতা। মর্মরধ্বনিতে দিগন্ত পর্যন্ত যেন মুখর হয়ে উঠলো। অশোক বারান্দার কিনারায় গিয়ে বাইরে দু বাহু বাড়িয়ে দিলে। ফোঁটা ফোঁটা জল লাগলো তার দেহে। তারপর বাড়িটার টালির ছাতে বৃষ্টিপাতের শব্দ জেগে উঠলো অন্য সকল শব্দকে ডুবিয়ে দিয়ে। ভিজে মাটির মধুর গন্ধে ভরে উঠলো ভুবন।

প্রথম বারিপাতের আবেশ প্রমোদের মনকে একটু অভিভূত করেছিলো। খানিক নিস্তব্ধ থেকে সে বলে উঠলো, অশোক, টেনিসের আশা গেলো ভেসে।

অশোক বললে, বোধ হয় না। মনে হচ্ছে বৃষ্টিটা স্থানীয় ও সাময়িক

মনসুন এতো শীঘ্র নামে না এখানে। তাছাড়া আমি কোর্ট করবার জন্য একটা জায়গার কথা ভেবেছি, সেখানে জল দাঁড়ায় না। উঁচু জমি, যেন প্রাকৃতিক বজ্‌রি কোর্ট। দেখা যাক কি হয়! কিন্তু বৌদিকে বড়ো অরসিক বলে মনে হচ্চে। আষাঢ়স্য প্রথম বাদলায় রান্নাঘরে? অতি বিষম কথা। দেখি একবার তাঁকে। বৌদি, ও বৌদি! অশোক মন্দার সন্ধানে ভেতরে ঢুকে রান্নাঘরের চৌকাঠে গিয়ে দাঁড়ালো।

মন্দা গুণগুণ করে গান গাইছিলো, 'সব যে হয়ে গেলো কালো, মিশে গেলো আঁধার আলো—।' অশোকের আগমনে মুখ ঘুরিয়ে মৃদু হেসে বললে, স্বাগত মেঘদূত। রসবোধ হারাবার ভয়ের চেয়েও তরকারি পুড়ে যাবার ভয় বেশি, তাই বাইরে যেতে পারিনি। এখান থেকেই আবাহন জানাচ্ছি বারিধারাকে। জলের ঝাপটা রান্নাঘরের বারান্দায় আসছিলো। মন্দাও দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। তারপর ফিরে গিয়ে রাঁধুনীকে কি বলে হাত ধুয়ে অশোকের কাছে এসে বললে, চলুন যাই। একবার রঞ্জুকে দেখে যাবো গায়ে কাপড় আছে কি না।

অশোক শোবার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলো, মন্দা ছেলেকে দেখে বেরিয়ে এসে একটা হাত অশোকের বুকের কাছে এগিয়ে এনে তৎক্ষণাৎ সরিয়ে নিলে, যেন বুকে হাত রেখে কথা কইতে গিয়ে থেমে গেলো। মুখে বললে, একটা কথা বলবো, অশোক বাবু? এই জলঝড়ে আর বাড়ি নাই গেলেন, এইখানেই খান, কি বলেন? কিন্তু আপনার মালিক রাগ করবেন না তো? মন্দা সম্মোহিনী দৃষ্টি দিয়ে তার দিকে চেয়ে রইলো।

অশোক বললে, বাগানের এ-পার আর ওপার, ঝড়জলের ভয় আর কোথায় ?

মন্দা ধমক দিয়ে বললে, না, থাকবেন আপনি যেমন বললুম। আমি বেয়ারাকে পাঠিয়ে খবর দিচ্ছি। তারপর বারান্দায় বেরিয়ে গিয়ে ধূমপানরত প্রমোদকে বললে, ওগো, আমি অশোকবাবুকে বলছি, আজ এইখানেই থাকুন খেয়েদেয়ে। এই জলে আর বাড়ি গিয়ে কাজ নেই।

একসঙ্গে বাস করে মিনিকে ছেড়ে থাকা অশোকের জীবনে এই প্রথম। সে সেকথা না ভেবে—কোনো কথাই না ভেবে মন্দার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলো। বস্তুতপক্ষে তার না বলবার ক্ষমতা হোলো না। বেয়ারা আলো নিয়ে চলে গেলো ও-বাড়িতে খবর দিতে।

খেয়েদেয়ে আবার বারান্দায় এসে অশোক দেখলে তিনখানা খাটে বিছানা পাতা। মাঝের বিছানাটার পাশে তেপায়ার ওপর প্রমোদের আলবোলা সাজানো। আয়া ওদিকের বিছানাতে রঞ্জুকে শুইয়ে দিয়ে গেলো। অশোক নির্দিষ্ট শয্যাটায় কাৎ হয়ে শুয়ে বাইরের দিকে চেয়েছিলো, তখনো বৃষ্টি পড়ছে যদিও আগেকার মতো তীব্র বেগে নয়। কাঁদনভরা মুখে হাসির মতো, বৃষ্টির মাঝেও আকাশের মেঘমুক্ত অংশে এক-আধটা নক্ষত্র দেখা দিয়েছে। তার মিনির কথা মনে হোলো। মনে হোলো, না থাকলেই হতো এমন করে। প্রমোদের আলবোলার একছন্দে বাঁধা শব্দ শোনা যাচ্ছিল, অশোক বলতে গেলো, প্রমোদ-দা জল থেমেছে, এইবার আমি যাই। হঠাৎ তার শিয়রের দিকের দরজার কাছে মন্দার চুড়ি বেজে উঠলো, মন্দা জিগগেস করলে, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি ? অশোক উঠে বসে

।ললে, না তো ! মন্দার মুখের দিকে চেয়ে তার বাড়ি যাবার শুভ সঙ্কল্প-টুকু উবে গেলো। প্রমোদকে বলা যেতো। অন্য একজন পুরুষের কাছে চিত্তের দুর্বলতা প্রকাশিত হয়ে যাওয়াটা হয়তো ততোটা লজ্জার হতো না, কিন্তু মন্দাকে কথা দিয়ে আর কথা ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। এই চতুরাকে জানানো যায় না যে সে একটা রাতও বধূ-বিচ্ছেদ সহ্য করতে অক্ষম নয়, শুধু লজ্জায় পড়ে মন্দার কথা এড়াতে পারেনি।

মন্দা অশোককে পান দিয়ে ওদিকে নিজের বিছানায় গেলো। প্রমোদকে লক্ষ্য করে বললে, হ্যাঁগো, এ জগতে আছো, না ধূম্রলোকে? চেয়ে দেখো না। দু'পেগ তো রোজই খাও বাপু!

প্রমোদ চোখ না চেয়েই বললে, বলো না কি বলবে, আমি শ্রবণ করছি। বলছিলুম কি, কাল সকালে সামনের ও পাহাড়টায় গিয়ে চা খেলে কেমন হয়? বৃষ্টি হয়ে তো বেশ স্নিগ্ধ হয়ে গেলো।

অশোক কি বলে? কি বলো অশোক?

অশোক কিছু বলে না। মন্দা হাসলে। আমার মতেই ওঁর মত। কি বলেন অশোকবাবু?

প্রমোদ বললে, অল রাইট মন্দা। অশোক কিছু বললে না। মন্দার হুকুমের ধরনে তার দিকে নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলো।

মন্দা বললে, আর এক কথা বলি তোমাকে। আমরা যদি তর্ক করতে লেগে যাই তোমার ঘুমের ব্যাঘাত হবে না তো? প্রমোদের উত্তর এলো মৃদু নাসিকাগর্জনে। মন্দা খিলখিল করে হেসে উঠলো।

ভূরিভোজনের সঙ্গে হুইস্কি, জেগে থাকবার কথা নয়। আপনি আর যাই

করুন অশোকবাবু এ পথে যাবেন না। মিনির গ্লানির, অন্তর্দাহের অন্ত থাকবে না তাহলে।

অশোক কথা ঘুরিয়ে দিলে। তখন বঙ্গসাহিত্যে 'সবুজ পত্রের' যুগ কবির 'ঘরে বাইরে' সবেমাত্র শেষ হয়েছে কিন্তু তার আলোড়ন তখনো থামেনি। অশোক জিগগেস করলে, 'ঘরে বাইরে' সবটা পড়েছেন বৌদি?

হুঁ, কিন্তু আমার তা ভালো লাগে না বলে রাখছি।

অবাক করলেন বৌদি। রবীন্দ্রনাথের লেখা ভালো লাগে না আপনার লাগবে কি করে বলুন। আপনাদের সন্দীপ দেশ-দেশ করে উন্মত্ত হোলো, 'বন্দেমাতরম' নির্ঘোষে বাঙালীর চিত্তকে দোলালো। ভালো কথা, কিন্তু যেই মক্ষিরানীর উদয় হোলো অন্তঃপুরের বাইরে, ব্যস্। কবি যদি সন্ন্যাসী দেশনেতার মনেও নারীলোলুপতা জাগিয়ে তাকে অবনত করতে চেয়ে থাকেন, সে অন্য কথা ; তাতে তিনি কৃতকার্যই হয়েছেন। কিন্তু আমি কি ভাবি জানেন? সকল পুরুষেরই ওই দশা। যেই তার পথে কোনো সুন্দরীর উদয় হয়, দেশ ব্রত সঙ্কল্প সব যায় ভেসে ভাগিরথীর ঘোলা জলে। আপনি হয়তো বলবেন, রাজনীতিতে একটু ওর নাম কি নারী-পূজার বাধা নেই ; সাহেবদের দেশের অনেক রাজনীতিজ্ঞের অমন ঝুড়ি-ঝুড়ি উদাহরণ হয়তো দিতে পারবেন। কিন্তু আমাদের দেশে দেশসেবক হওয়া যে ভিন্ন কথা। বঙ্কিমের যুগ থেকে দেশসেবায় ধর্মাচরণ আছে, অসিধারাব্রতের মতো কঠিন আচারপালনের নিয়ম দাঁড়িয়ে গেছে মুক্তিপ্রয়াসে নারী তো সহায়ক নয় ; তাকে দর্শন করা স্পর্শ করা পাপ

তার দ্বারা ভ্রষ্ট হওয়াই স্বতঃসিদ্ধ কথা। শান্তি স্ত্রী হয়েও জীবানন্দের সহায় হয়নি, ভ্রষ্টই করেছে জীবানন্দকে। আর কল্যাণী বা আপনাদের মক্ষিরানী বিমলা তো একই—পরকীয়া। তার স্পর্শের কথা আর নাই বললুম। জিগগেস করে দেখুন না নিজেকে, এই পরকীয়ার আকর্ষণ বড়ো, না ব্রত আচার-নিষ্ঠার জোর বেশি?

মন্দার শিয়রের দিকে একটা মৃদু-করে-দেওয়া আলো, কিন্তু সে স্তিমিত আলোকেও তার মুখ দেখা যাচ্ছিলো। অশোক পরম বিস্ময়ে তার মুখের পানে চেয়ে ছিলো। সে মন্দাকে মিষ্টি চতুর সঙ্কোচব্রীড়াহীনা একটু অসাধারণ মেয়ে বলেই জেনেছিলো, কিন্তু এখন তার চিন্তার বৈশিষ্ট্য শুনে অবাক হোলো। সমালোচনার সত্য-মিথ্যা যুক্তি-অযুক্তি হয়তো গ্রাহ্য করবার মতো নয়, কিন্তু তার ব্যক্তিত্বে বা বৈশিষ্ট্যে সন্দেহের স্থানমাত্র নেই। অশোকের বুদ্ধি গেলো ঘুলিয়ে। সে হার মেনে ও-বিষয়ে আর কথা না বাড়িয়ে বিষয়ান্তরে চলে গেলো, বললে, আচ্ছা, 'ঘরে বাইরে'কে না হয় মাফ করা গেলো, দেশচিন্তার বড়ো বড়ো কথা আমিও বুঝিনে। শ্রদ্ধেয় যাঁরা, পথপ্রদর্শী যাঁরা, তাঁদের কথা বিনা তর্কে বিনা দ্বিধায় অকপটে মেনে নেওয়া আমার স্বভাব এবং আমার কর্তব্য। আপনি শরৎবাবুর 'চরিত্রহীন'-এর বিষয়ে কি বলতে চান? সে যুগটা 'চরিত্রহীন'-এরও যুগ ছিলো।—শরৎবাবুর জ্যোতিও তখন সাহিত্য-গগনে প্রকাশমান।

মন্দা মাথা হাতে ভর দিয়ে কাৎ হয়ে শুয়েছিলো, অশোকের নূতন প্রশ্নে উঠে বসল। তার দিকে উদ্দীপ্ত চোখের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে পাল্টা জিগগেস

করলে, আচ্ছা অশোকবাবু, আপনাদের ওটা ভারি ভালো লাগে, না? লাগবারই কথা।

অশোক প্রশ্ন করলে, মানে?

মন্দা খিলখিল করে হেসে উঠলো, মানে অনেক, মানে সুগভীর। এখনই শুনতে হবে? তার আগে বলি, শরৎবাবুর অধিকাংশ লেখা আমি পড়তে পারিনি। তাঁর অবনতের, অণ্ডার-ডগের সপক্ষে ওকালতী যতোই মর্মস্পর্শী, যতোই জোরালো হোক না কেন, অধিকাংশ নিম্নশ্রেণীকে নিয়ে কারবার, আমার গা ঘিনঘিন করে। সমাজের আন্তরিক টান আমাদের সকলকেই নীচে নামিয়ে দেবার। কি একটা সংস্কৃত বাক্য আছে না?—নীচের যে সে ওপরে উঠছে, উপরের যে সে অধোগতির অভিমুখে। চক্রনেমির মতো সকলের দশাবিপর্যয় হচ্ছে ক্রমাগত; 'নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ।' মন্দার চাতুর্য, আলোচনার ঢঙ দেখে অশোক শিউরে উঠলো, মনে মনে মন্দাকে নিজের চেয়ে অনেক উঁচুতে স্থান দিলে।

একটু থেমে মন্দা বললে, লেখকের কাজ এই অধোগতি ঠেকানো, না সেটাকে সার্থক করে তোলা? পিতৃকুলে শ্বশুরকুলে আমার আমি অসংখ্য চরিত্রহীন দেখেছি, তা বলে শরৎবাবুর সতীশের মতো এমন করে একটা দাসীর পেছনে ডিগনিটি মর্যাদা সম্ভ্রম হারাতে দেখিনি কাউকে। হোন না চরিত্রহীন আপনারা, কি আসে-যায় তাতে? তাতে দুঃখ নেই। কেউ বা ফেরে কেউ বা ফেরে না ওপথ থেকে। কিন্তু সম্ভ্রম হারানোটাই দুঃখের আর লজ্জার।

অশোক নির্বাক শ্রোতা; মন্দার বাক্যস্রোতে একটা ঢিল ফেলেও সামান্য একটু আলোড়ন জাগাবার ক্ষমতা ছিলো না তার। তার মনে পড়ে গেলো মন্দার বাপেরা পুরুষানুক্রমে জমিদার। স্বামীও দু'পুরুষে ব্যারিস্টর, তারও পিতামহ প্রপিতামহ প্রজা ঠেঙিয়ে গেছেন। এখন মনে পড়লো মোদ কদাচ কোনো চাকরের সঙ্গে বাক্যালাপ করে। হাততালি ও ইঙ্গিতের দ্বারা তাদের সেবা আদায় করে। মন্দাও অনেকটা তাই। ওরা ধনী না হলেও ওদের দুজনকে ঘিরে এমন একটা আবহ আছে যাতে নীচু যারা তারা কাছে যাবার সাহস পায় না।

মন্দা বোধ করি চুপ করে অশোককে লক্ষ্য করছিলো, স্বর উচ্চ করে বললে, ও অশোকবাবু, মুষড়ে গেলেন যে নিজের শ্রদ্ধামন্দিরগুলি ভূমিসাৎ হতে দেখে। একটা কিছু বলুন আপনি! আমার মনে হচ্ছে আমি যেন পূজনীয়া গোঁসাই ঠাকরুণ, জড় ভক্তদের বাণী বিলিয়ে দিচ্ছি।

অশোক বললে, না, আমি শুনছি; নূতন কথা শুনতে ভালোও লাগছে। তখন যে বললেন, আমাদের 'চরিত্রহীন' ভালো লাগে, লাগবারই কথা। মানে অনেক, মানে সুগভীর। কি মানে সে?

মন্দা কলকণ্ঠে হেসে মুখে আঁচল চাপা দিলে। স্তিমিত আলোকেও তার দোদুল্যমান দুলের হীরা জলজল করে উঠলো, যেন শাণিত হৃদয়ভেদী বাক্যের প্রতীক হয়ে। অবশেষে মুখ থেকে আঁচল সরিয়ে বললে, এখনি শুনবেন? এই নিশীথ রাত্রে? দোষ দেবেন না যেন শেষকালে! ভালো লাগে কেন যানেন? আপনাদের প্রত্যেকের মনে দুষ্টা চরিত্রহীনা অনায়াসসাধ্যা নারীর জন্য মন্দির গড়া আছে। সন্ধানটি পেলেই তাকে

বিগ্রহ করে সেখানে বসিয়ে দেন, পরে সে গ্রহ বা গলগ্রহ যাই কিছু হোক না কেন। বুঝলেন? আপনাদের মনে আবার স্বাভাবিক মৃগয়াবৃত্তি আছে কিনা! উদাহরণ? এই যে সামনে। সে প্রমোদের দিকে আঙুল দেখালে।

অশোক বুঝলে আলাপের বিচরণক্ষেত্রটা বিপদসঙ্কুল হতে চলেছে, বললে, থাকগে বইয়ের কথা বৌদি। আপনাদের জীবনের গল্প বলুন, কিছুই জানিনে।

মন্দা আবার পূর্বের মতো শুয়ে পড়ে গল্পের মোড় ঘুরিয়ে দিলে। অশোক শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে দু'একটা প্রশ্ন করতে থাকলো। অনেকক্ষণ পরে বসবার ঘরের ছোট টাইমপিসটায় দুটো বাজল। মন্দা সচকিত হয়ে বললে, আর নয় অশোকবাবু, অনেক রাত হয়েছে, এইবার ঘুমোন। মন্দা ওপাশ ফিরে শুয়ে নিঃশব্দ হলো। অশোক আনমনে মন্দার তর্কের কথা ভাবতে লাগলো আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে। আকাশ তখন বৃষ্টিবিধৌত, নির্মল, নক্ষত্রালোকে ঝলমল করছে। কোনো একসময়ে সে ঘুমিয়ে পড়লো।



তিন

একটা উপলভরা প্রায়-জনশূন্য নদী পার হয়ে অশোকেরা যখন একটা পাহাড়ের তলদেশে এসে পৌঁছ্‌লো তখন একটু রোদ উঠেছে। বেয়ারা একটা পাথরের আড়ালে স্টোভ ধরালো। এক টুকরো ঘাস-জমিতে জাজিম বিছিয়ে বসে মন্দা টিফিন-বাস্কেট খুলে খাবার সাজানোতে রত হোলো। প্রমোদের মুখে পাইপ, মুখভাব নিরাসক্ত সন্ন্যাসীর। অশোক মন্দাকে সাহায্য করতে গিয়ে আনাড়িপনার জন্য ধমকানি খেলে। হৃষ্টচিত্তে সে বললে, একটু সৌজন্যও দেখাতে দেবেন না, বৌদি ; আমি কি ছাই কিছু জানি ; খেতেই শুধু জানি যে !

মন্দা বললে, পালান আপনি, আমার কাজ বাড়াবেন না। আহা, আপনার হাতে কি ছিরিই হোলো রুটিগুলোর! আপনি রঞ্জুর সঙ্গে খেলুন গে।

অদূরে রঞ্জু আয়াকে কেন্দ্র করে প্রজাপতির ঝাঁকের পিছনে চারদিকে ছুটে বেড়াচ্ছিল। সে সঙ্গী পেয়ে উল্লসিত হয়ে উঠলো। প্রজাপতির দিকে ছোট ছোট আঙুল দেখিয়ে সে অশোককে বললে, উস্‌কো পক্‌ড়ো অছো বাবু ; ইস্‌কো পক্‌ড়ো।

অশোক পতঙ্গগুলোকে তাড়া করে কোনোটাকে ধরিধরি করলেও মায়ায় ধরতে পারে না, রঞ্জুকে বলে, ওই যাঃ, উড়ে গেলো রঞ্জু! ধরতে

পারলুম না। রঞ্জু তার অকৃতকার্যতায় খুশি হয়ে হাততালি দিয়ে কলরব করে ওঠে। অশোকের আজ প্রথম নজর গেলো প্রজাপতি কতো বিচিত্র, কতো বিচিত্র তাদের বর্ণসম্ভার, কতো বিচিত্র তাদের পাখার আঁকা-জোঁকা, নিখুঁত সামঞ্জস্যের। ধূম্রবর্ণ পাহাড়, ফুলের হলুদবরণ ঢেউ, বরাশফুল পাহাড়তলিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। রঙ লাগলো অশোকের মনে। তার চোখে ঘোর, হৃদয়ে স্বাচ্ছন্দ্য, তার অতো বড়ো দেহেও লঘুগতি। রঞ্জুর মতোই অশোক আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠলো।

মন্দা প্রস্তুত হয়ে ডাক দিলে। অশোক খায় আর খাবার ফুরিয়ে যায়। প্রমোদ হেসে উঠলো, দ্যাট্‌স্ লাইক্ এ ম্যান, অশোক। মন্দা তোমার ভাঁড়ার খালি হোলো নাকি?

মন্দা বললে, অশোকবাবু, আর দেবো না, তাহলে বেয়ারা-আয়া বেচারাদের জন্য কিছুই থাকবে না, আমিও থাকব অনাহারে। আপনি পাপে ডুবে যাবেন।

অশোক লজ্জিত হোলো। কথা ঘোরাবার জন্য বললে, দেখুন দেখুন বৌদি, আপনার ছেলে হাঁড়ি খেয়েছে। রঞ্জুর মুখ নাসাগ্র পর্যন্ত জ্যাম মাখানো।

মন্দা হাসল, বললে, নিত্য খায়। যাই বলুন, হাঁড়ি-খাওয়া করে জ্যাম-আচার না খেলে খাওয়ার সুখ নেই। আমি এখনো ও বস্তুগুলি খেতে খেতে চোখ নিচু করে নিজের নাকের ডগাটা দেখে নিই। মন্দা ও অশোক হো হো করে হেসে উঠলো।

খাওয়া শেষ হতেই মন্দা বললে, চলুন্ অশোকবাবু, পাহাড়ে উঠি। হ্যাঁগো, তুমি যাবে ? চলো না, মাথাটা সাফ হয়ে যাবে।

মুখ থেকে সদ্যসজ্জিত পাইপটা সরিয়ে নিয়ে প্রমোদ বললে, তোমরা যাও। ইট্‌স্ টু ম্যচ ফর মি।

হাম যায়েঙ্গে মম্‌সি।

আয়াকে মন্দা ইঙ্গিত করলে। সে রঞ্জুকে কোলে তুলে নিয়ে বললে, নহি বাবা নহি, পাহাড় মে শের হয়, বড়া বড়া পথ্থর হয়।

সংযম-শিক্ষিত শিশু, বুঝলে যেতে নেই। সে আয়ার বাহুবন্ধন থেকে পিছলে পড়ে আবার প্রজাপতির পিছনে ধাবমান হোলো মাথার দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ নাচিয়ে।

জুতো খুলুন বৌদি, অত উঁচু গোড়ালিতে পতন অনিবার্য। অশোক নিজের জুতো খুলে ফেললে। ওপরে ওঠবার মতো একটা স্থানে আসতে মন্দা বললে, আপনি আগে যান, অশোকবাবু।

আমি যাবো ? আচ্ছা। কিন্তু যদি গড়ান ?

উনি এখান থেকে সোজা ঘটকবাড়ি যেতে পারবেন, ভয় নেই।

অশোক ওপরে ওঠে, মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে মন্দার অপেক্ষা করে। সে কাছে এলে একটু বিশ্রাম করে আবার অগ্রসর হয়, আবার থামে। মন্দার শ্বাসপ্রশ্বাস সংযত হলে আবার ওঠে। পাহাড়টা উঁচু মাত্র শ-তিনেক ফুট, কিন্তু পথটা ঢালু। পাথরকুচি আর মসৃণ উপলে ভরা বলে বন্ধুর ও আরোহণ শ্রমসাধ্য। মন্দা পরিশ্রমে রক্তিম হয়ে ওঠে, চূড়ার তলায়

একটু সমতল স্থানে এসে ছায়ায় একটা পাথরে বসে সে বললে, দাঁড়ান, একটু বেশি করে জিরিয়ে নিই।

দ্রুতনিশ্বাস সহজ হয়ে আসতে মন্দা জিগগেস করলে, আচ্ছা, এখানে বাঘ-টাঘ থাকে না তো ?

শুনিনি তো কখনো।

থাকলেই বা আর কি! খায় যদি হৃষ্টপুষ্টটিকেই খাবে। তন্বী নারীর মানুষের সমাজে যতোই আদর থাক ব্যাঘ্র সমাজে নেই বোধ করি। বরং আপনাকে খেয়েদেয়ে আমাকে ব্যাঘ্রবাহিনী জগদ্ধাত্রীর মতো পিঠে বসিয়ে আমার স্বামীপুত্রের কাছে ফিরিয়ে দেবে। কি বলেন? চলুন, উঠুন। ভারি কুঁড়ে আপনি।

পাঁচ মিনিটে ওরা ওপরের থ্যাবড়া চূড়াটায় উঠে গেলো। সেখান থেকে সমগ্র দুন-উপত্যকাটা যেন একটা বিরাট পিরিচের মতো প্রতীয়মান হতে থাকল। অশোক দেখাতে লাগলো : ওই দেরাদুন। ওপরে ওই ল্যাণ্ডোর বাজার। এ পাশে ওই ফরেস্ট কলেজের বসতি। নদীপারে ওই আমাদের বাড়ির লাল টালির ছাত দেখা যাচ্ছে।

মন্দা হঠাৎ জিগগেস করলে, এতোটা উঠতে আপনার কোনো পরিশ্রম হয়নি অশোকবাবু?

অশোক সস্মিতমুখে বললে, অতি সামান্যই। এখন তার কোনো জের নেই।

আচ্ছা, আপনি এই পাথরটা তুলে ফেলতে পারেন?

সে সঙ্কুচিত হয়ে বললে, থাক না।

না ফেলুন। দেখি আপনার গায়ে কতো জোর। খ্যাতিই শুনেছি জোরের, চোখে দেখিনি।

অশোক পাঞ্জাবি খুলে মালকোছা মেরে বললে, কোনটা ? একটা চৌকো ছোট পাথরের ওপর সে একটা পা দিয়ে দাঁড়িয়ে সেটাকে নাড়া দিয়ে ভূমিশয্যা থেকে ঢিলে করে ফেললে। মন্দা নির্নিমেষে তার পেশীস্ফীত দেহের, উন্মুক্ত ভীম বাহুদুটির পানে চেয়ে রইলো।

অশোক অবলীলায় পাথরটাকে মাথার উপর তুলে দূরে নিক্ষেপ করলে, সেটা সারাটি উপত্যকায় নির্ঘোষ জাগিয়ে নিচে গড়িয়ে গেলো। উৎসাহে সে আর একটাকে তুলে পূর্বগামীর পথে পাঠিয়ে দিলে। তারপর স্ফীতশিরা স্বেদাঙ্কিত ললাটে সে মন্দার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগলো। মন্দার চোখেও ভাস্বর দীপ্তি, মুখ আরক্তিম, নাসা স্ফীত। ক্ষণিক চেয়ে থেকে মন্দা উঠে দাঁড়িয়ে যে শিলাটায় বসেছিলো সেইটা দেখিয়ে বললে, এইটা।

শক্তিমানের শক্তি জেগে ওঠা যে কী তা অমানুষিক দৈহিক শক্তির যারা অধিকারী হয়নি তারা কোনোদিন উপলব্ধি করতে পারবেনা। অশোকের সেই শক্তি জেগে উঠলো, আর জাগলো প্রিয়দর্শনা নারীর কাছে শক্তির পরীক্ষা দেবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা, যা পৃথিবীর আদি দিন থেকে পুরুষকে অসাধ্য সাধন করতে ক্ষেপিয়ে এসেছে।

পাথরটা বড়ো, অন্তত মণ কুড়ি। অশোক স্বেদসিক্ত গেঞ্জিটা খুলে অন্য একটা পাথরের ওপর রাখলে। সূর্যকিরণে তার তরঙ্গায়িত পেশীসমষ্টি ঝলমল করে উঠলো। একবার পাহাড়টার কিনারায় গিয়ে নিচ পর্যন্ত

দেখে নিয়ে সে পাথরটা থেকে একটু দূরে পা রেখে দেহ ঢালু করে সেটাকে অমানুষিক বলে ঠেলতে লাগলো। বার বার প্রয়াসে শিলাটা একটু নড়লো, তারপর স্থানচ্যুত হয়ে একদিকে কাত হয়ে গেলো। অশোক একটু দাঁড়িয়ে বিশ্রাম করলে। তার দেহ স্বেদধারায় চিক্কণ, পায়ের নিচের জমি পর্যন্ত ভিজে উঠেছে। বাতাসে ব্যায়ামাগারের গন্ধ। মন্দা আর একটা পাথরে বসেছিলো। অশোক তাকে বললে, আমার পিছন দিকে এগিয়ে দাঁড়ান আপনি। তারপর সে পাথরটার উপর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলে।

অশোক নিজের বিপুল বলপ্রয়োগের ঝোঁকে হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলো। হাতের তালু কাটলো একটু-আধটু, কিন্তু চারদিকে প্রতিধ্বনি হতে থাকলো—গুম গুম গুম।

সে উঠে দাঁড়াতে মন্দা তার আরক্তিম চোখের দিকে পলকশূন্য দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে রইলো। অশোকের বুক তখন পরম অমানুষিক শ্রমে উদ্বেল। একটু পরে সে ওপর দিকে দুই বাহু বিস্তার করে হাওয়ার দিকে ফিরে হাঁ করে শ্বাস নিতে লাগলো ; ক্রমশ তার উত্তেজিত পেশী শান্ত হোলো, নিশ্বাসে সহজ সমতা ফিরে এলো। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে সে মন্দার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে দীর্ঘ চওড়া একটা শীতল শিলার ওপর দেহ বিস্তার করে শুয়ে পড়লো।

মন্দা উঠে এলো কাছে, মৃদুস্বরে বললে, কি বলবো আপনাকে—ব্রুট না মানুষ ?···না বজরঙ্গবলী দেবতা ? বলুন না ? একটু থেমে বললে, খুশি হয়েছি কিন্তু !

অশোক উজ্জ্বল চোখে উঠে বসলো। মন্দা তার দেহের কাছে হাত এগিয়ে এনে আবার পিছিয়ে নিয়ে বললে, আপনার মাস্‌ল্‌ দেখবো যে! দেখবো? অশোকের মতের অপেক্ষা না করেই সে দুই করপল্লব জোড়া করে অশোকের দক্ষিণ বাহুটা ঘিরে ধরলে। তার উষ্ণ শ্বাস অশোকের বুকে পড়তে লাগলো। মন্দা পেশী টিপতে টিপতে বললে, বাবা, আপনি মানুষ না কি?—এবার চলুন নিচে যাই।

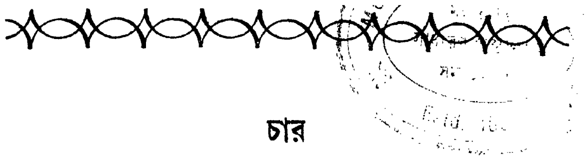
তারা নিঃশব্দে নিচে নামতে লাগলো। মাঝপথে এসে এক সময়ে মন্দা হঠাৎ বললে, আপনাকে কিছু বলে-কয়ে কোনো লাভ নেই। তৎক্ষণাৎ সে তরতর করে নেমে গেলো, পথটা আর বন্ধুর ছিলো না। অশোক সে উক্তিটা বুঝতে পারলে না, কোনো উত্তরও দিলে না। নিচে এসে মন্দা যখন উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রমোদের কাছে অশোকের বীর্য বর্ণনা করতে লাগলো তখনো সে চুপ করে রইলো। বাড়ির পথে মন্দাও আর কোনো কথা কইলে না। বাঙালিয়াটা আগে পড়ে। অশোক ভেতরে না ঢুকে ফটক থেকেই বললে, চললুম প্রমোদ-দা।

মন্দা যখন তার দেহ ছুঁয়েছিলো অশোকের তখন চৈতন্য হোলো। সে ভাবতে লাগলো—এ ঠিক নয়, এ ঠিক নয়। অনুভূতিটা কি যেন কি রকম। অবিরাম খেলে খেলে অশোকের মন গভীরতা হারিয়েছিলো। তার অনুভূতি সবই বাহ্যিক, সবটাই ক্ষণিক, চিত্ততলে কিছু সোজাসুজি প্রবেশ করতো না। সে অবিরাম সাধনায় শিখেছিলো ক্ষণিকের বাহ্যিক প্রয়াসের কথা। বিশেষ মুহূর্তটিতে শক্তি মন আন্তরিকতা নিয়োগ করতো, মুহূর্তের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে সবই তার ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়

হয়ে যেতো, মনে গভীরভাবে প্রবেশ করতো না। আজ তার মনের ভিন্ন রূপ হয়ে গেলো। মনে তার বিক্ষোভ, কিন্তু কিসের বিক্ষোভ সে তা ধরতে পারলে না।

মিনি ছিলো শোবার ঘরে। আরাম-কেদারায় পড়ে ভিজে চুল এলিয়ে দিয়ে জানলার বাইরে চেয়েছিলো। অশোক লক্ষ্য করলে দেখতে পেতো মিনির চোখে নিদ্রাবিহীনতার কালি পড়েছে। সে অশোককে দেখে মুচকি হাসলে। অশোক টুক্-করে মিনিকে বুকে তুলে নিয়ে অবিশ্রান্ত চুম্বন করতে লাগলো। মিনি, আমার মিনি, মিণ্টি, রাগ করেছো? অপরাধ অনেক হয়েছে—অনেক, অনেক, অনেক।

মিনি শান্তচিত্তে অশোকের গালে ঠোঁট বুলিয়ে দিয়ে মৃদুস্বরে বললে, কি যে বলো! অতো বৃষ্টিতে আসতেই বা কি করে? বেশ করেছো আসনি। কিন্তু মিনির চোখভরা জল। দুজনের মুখ পাশাপাশি, অশোক অশ্রুজল দেখতেও পেলে না। হঠাৎ তার মন্দাকে মনে পড়লো, সে বিরক্তিতে ভ্রূকুঞ্চিত করলে।



চার

অনাচারপিষ্ট শিশুর মাথায় অঙ্গে যেমন শুদ্ধচেতা গৃহিণী গঙ্গাজল দিয়ে শুদ্ধ পবিত্র করে নেন, অশোক তেমন করে নিজেকে কূপোদকে বিধৌত করলে সেদিন। গুসলখানার তোলা অল্প জলে দেহের ক্লেদ যেন ধুয়ে যাবার নয়। অশোক কুয়োর চাতালে গিয়ে বসলো, মালী একজন তার মাথায় ডোলের পর ডোল জল ঢেলে দিলে তার নির্দেশমতো। দুপুরে সে মিনিকে ধরে আনলে ঘরে। দক্ষিণ ঊর্ধ্ববাহুর যেখানটা মন্দা হাত দিয়ে জড়িয়েছিলো, মিনির একটা হাত নিয়ে সেখানে বুলোতে লাগলো; তার বুকের যেখানে মন্দার উষ্ণশ্বাস পড়েছিলো, সেইখানে মিনির মুখ চেপে ধরলে। মন্দার চুলের সুবাস তার নাসারন্ধ্রে বাসা করেছিলো, মিনির কোমল মুখখানি বুকে রেখে অশোক তার কেশ আঘ্রাণ করতে থাকলো। এই বিচিত্র গঙ্গোদকে তার সকল ক্লেদ সকল গ্লানি গেলো ভেসে।

মিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলো অশোকের বাহুতে মাথা রেখে। সকালের মতো তার মুখ আর পাণ্ডুর নয়। গালে ঈষৎ উষ্ণ লালিমা, শ্বাস-শ্রমকম্পিত আঁখিপল্লবে শান্তি, তৃপ্তি। দুপুর ঢলে পড়লো বিকেলের দিকে। বারান্দায় কেউ মৃদু গলার শব্দ করলে। সযত্নে মিনির মাথা বালিশে রেখে, তার বুকের বিক্ষিপ্ত বসন সংযত করে, ঘরের পর্দাটা টান

করে দিয়ে অশোক বাইরে গেলো। একটা চাকরকে সে দেরাদূনে পাঠিয়েছিলো ব্যাডমিণ্টনের সরঞ্জাম কিনতে, সে ফিরেছে জিনিসগুলো নিয়ে। অশোক সেগুলো পরীক্ষা করে বললে, ও বাংলায় পৌঁছে দিয়ে আয় এ-সব, আর বাংলার বাঁ-দিকের ঘাস-জমিতে খোঁটা পুতে দিবি নেট টাঙাবার জন্য, নেটও টাঙাবি। তুম্‌হে তো মালুম হ্যয় সব্‌। চাকর জিনিসগুলো সংগ্রহ করে যেতে উদ্যত হোলো। একটু ভেবে অশোক বললে, ঠহর যাও এক মিনট। বসবার ঘরে গিয়ে একটা টুকরো কাগজে লিখলে, প্রমোদ-দা, আপনারাই খেলবেন আজ, বোধ হয় আমি যোগ দিতে পারবো না। সকালের দস্যিবৃত্তিতে সর্বাঙ্গে ব্যথা। চাকর চিঠি নিয়ে চলে গেলো। অশোক ঘরে ফিরে গিয়ে দেখলে মিনি উঠে খাটের থামে ঠেস দিয়ে বসে আছে। চারচক্ষুতে মিলন হতেই সে আঁখি নত করে বললে, যাও, ভারি দুষ্টু তুমি! সে প্রসারিত পা দুটির ওপর কাপড় টেনে দিলে।

দিনের আলো ম্লান হবার সঙ্গে সঙ্গে ও-পাড়ায় ব্যাডমিণ্টন চুকলো। প্রমোদ মন্দার পিছনে পিছনে বারান্দায় উঠতে উঠতে জিগগেস করলে, একবার অশোকের খবর নিতে যাবে না কি?

মুখ না ঘুরিয়েই মন্দা নিস্পৃহস্বরে উত্তর দিলে, তা চলো। কাপড় বদলে আসছি আমি।

প্রমোদ একবার হাততালি দিয়ে বেতের কেদারায় বসে শ্রান্তি অপনোদন করবার জন্য দেহ সম্প্রসারিত করলে। অনেক দিনের পর খেলার শ্রমে তার রক্তে যেন উষ্ণ বুদ্বুদ জেগে উঠেছে।

নিঃশব্দচরণে বেয়ারা এসে দাঁড়ালো। তার উপস্থিতি অনুভব করে সে নিমীলিত চোখেই মৃদুকণ্ঠে বললে, ছোটা পেগ অওর সিগার।

নিমেষে বেয়ারা একটা পেগ-টেবিলে সব রেখে গেলো।

সিক্ত অধোবাস, শাড়ি বদলে বিক্ষিপ্ত চুল ঠিক করে মন্দা প্রস্তুত হয়ে বাইরে যাবার জন্য পা বাড়ালে, তারপর হঠাৎ কি ভেবে একটু মুচকি হেসে আয়না-টেবিলে ফিরে গিয়ে একটা হীরার নাকছাবি পরলে। হীরাটা একটা মটরের মতো বড়ো। সে আলোটা মুখের কাছে তুলে সমুখে ঝুঁকে পড়ে খানিকটা ক্ষণ দর্পণে নিজের মুখ দেখলে, দর্পণ আর নারীদর্পহারী নয়—চাটুকারের মতো মাধুর্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। নাকছাবিটাকে ঈষৎ নাড়াচাড়া করে ঠিক করে নিলে। তারপর বাইরে এলো।

ওদের আসতে দেখে গিনি ভেতরে পালালো। প্রমোদ বারান্দায় উঠতে উঠতে অশোককে জিগগেস করলে, হ্যালো ভীম, বেদনা কেমন ?

অশোক হেসে উঠলো।

মন্দা বলে উঠলো, সারাটা মহাভারত ঘাঁটলেও ভীমের গায়ের ব্যথার সংবাদ পাওয়া যায় না। এমন কি গন্ধমাদন তুলে হনুমানের গায়েও বেদনা হয়নি। অশোকবাবুর বেদনা অন্য কিছুর, নয় অশোকবাবু ? অশোক চোখ নামালে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু'চারটে কথা কয়ে প্রমোদ বললে, তোমরা গল্প করো, অ্যাণ্ড আই গো ফর এ স্ট্রোল—নদীর কিনারা পর্যন্ত। ফেরবার সময়ে তোমাকে নিয়ে যাবো মন্দা।

অশোক বললে, এক পেয়ালা চা কি কফি খেয়ে যান না, প্রমোদ-দা ? শৃঃ। আই হ্যাভ হ্যাড মাই ওঅশ্। স্নান ছাড়া জলের কারবারে আমি নেই।

মন্দা খিলখিল করে হেসে উঠলো, জানেন না বুঝি অশোকবাবু, উনি যে শুধু আবকারি আইনের ব্যারিস্টর ! প্রমোদ মুচকি হেসে চলে গেলো। বসবার ঘরে উজ্জ্বল একটা তিনশো-বাতির হ্যাসাগ জ্বলছিলো। মন্দা মিনিকে টেনে এনে অশোককে বললে, আসুন, এই ঘরে বসি। মিনি তুইও খেলতে যাবি তো ? মিনি দুহাতে মুখ ঢাকা দিয়ে সবেগে মাথা আন্দোলিত করে আপত্তি জানালে।

আলোটা ছিলো ম্যাণ্টল্‌পিসের ওপর। মন্দা মিনিকে পাশে নিয়ে বিপরীত দিকে বসলো ; ম্যাণ্টল্‌পিসের নিচে একটা আসন দেখিয়ে অশোককে বললে, আপনি ঐটেতে বসুন গিয়ে। তারপর অশোকের দিকে পিঠ মুড়ে মিনির সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলে। চা-খাওয়া সমাপন হলে মন্দা মিনিকে একটা কথার খেই ধরিয়ে দিলে, সে বকে যেতে লাগলো। মন্দা তখন আস্তে আস্তে সোজা হয়ে বসলো। আজ সে মিনিকে স্পর্শ করলে না পর্যন্ত। তারপর অশোকের মুখের ওপর নিজের স্থিরদৃষ্টি স্থাপন করলে। যাদুকরী প্রভাতে তার দেহে প্রথম মাদকবিন্দু নিষিক্ত করেছিলো এখন তার ফল অন্বেষণ করতে লাগলো—প্রতিক্রিয়া কি বা কতোটুকু হয়েছে।

অশোক এতোক্ষণ শক্তিসঞ্চয় করছিলো মন্দার সম্মুখীন হবার, বললে, বিকেলে যাইনি, বৌদি, রাগ করেননি তো ? কাল যেতে পারবো

বোধ করি। কিন্তু আমাকে একা-একা যেতে হবে, মিনির দ্বারা খেলা হবে না, কি বলো মিনি ?

না, রাগ করবো কেন শুধু শুধু। মন্দা অশোক-মিনির অলক্ষ্যে মুখটা ঈষৎ ঘোরালো। নাকছাবির হীরার উজ্জ্বল দ্যুতি ইতস্তত পড়ছিলো মন্দার মস্তক সঞ্চালনে। সেই তীব্র প্রতিফলিত রশ্মি গিয়ে স্থির হোলো অশোকের চোখের ওপর। অশোক মুখ সরালো—রশ্মিও সরলো, রইলো তার চোখের ওপর। মন্দা অনর্গল কথা কয়ে যাচ্ছে অশোকের দিকে চেয়ে চেয়ে, হীরাটুকু শুধু লক্ষ্যশূন্য লক্ষ্যচ্যুত নয়। অশোক মাথা হেলায়, রশ্মিও হেলে ; সে সোজা হয়ে বসে, রশ্মিও সোজা সরল রেখায় তার চোখ দুটিকে আক্রান্ত করে। হঠাৎ অশোক এ-খেলা বুঝলো, তার হৃদপিণ্ড ধ্বকধ্বক করে উঠলো। সে সহসা উঠে পড়ে বললে, ঐ যা বৌদি, আপনার পান ফুরিয়ে গেছে, আনি গিয়ে। না, না, তুমি উঠোনা মিনা, আমি যাচ্ছি।

মন্দা শিহরণ-জাগানো মধুর হাসি হেসে উঠলো, যাদুকরী যেন কৌতুকে মেতেছে, বললে, ও অশোকবাবু, পালাচ্ছেন কেন, কি হোলো আবার ?

সেই ক্ষণে প্রমোদ ঘরে ঢুকলো, না বসেই বললে, মন্দা ডার্লিং বাড়ি যাবে ? চলো।

অশোক ফিরে এলো পান নিয়ে। মিনি গ্রামোফোন ক্যাবিনেটের আড়ালে লুকিয়েছিলো। মন্দা স্নিগ্ধস্বরে অশোককে বললে, কাল সকালে চা খাবেন আমার কাছে। এইবার পালাতে শিখেছেন আপনি, না যদি যান তাহলে বড্ড রাগ করবো কিন্তু।

অশোক তার আগ্রহে আর স্বরমাধুর্যে বিগলিত হয়ে উত্তর দিলে, যাবো বৌদি। পালাতে কেন যাবো অকারণে!

পরদিন প্রাতে মন্দা যেন অশোকের জন্যই বাইরে অপেক্ষা করছিলো। অশোক উপস্থিত হতেই সে সহাস্যমুখে ও অত্যন্ত সহৃদয়-চিত্তে তাকে অভ্যর্থনা করলে, যেন পূর্বরাত্রের দূরবর্তিনী আক্রামক নারীটি আর কেউ, সে নয়। অশোক বসে পড়ে জিগগেস করলে, প্রমোদ-দা কোথায় বৌদি?

এখনো শয্যাশ্রয়ে, এইবার ডাকবো। তাড়া নেই তো আপনার, বসুন না। তারপর সহসা ঠোঁট দুটি স্ফুরিত করে মন্দা বললে, ও অশোকবাবু, দিন যে আমার অচল হোলো! হাতে কাজ নেই, ওঁর মতো দিনে ঘুমোতেও পারিনে। দিন না একটা কিছু ব্যবস্থা করে! বিকেলে যাহোক একটা ব্যবস্থা হয়েছে, দুপুর যে কাটে না!

পড়বেন কিছু? তাহলে চলুন আজ কিছু বই খুঁজে আনবেন ও-বাড়ি থেকে, কিন্তু সবই তো সেকেলে বই, যাকে বলে ক্লাসিক্যাল, যা কেউ পড়ে না, ঘরে সাজিয়ে রাখে।

ওমা, এতোদিন লেখাপড়া শিখে আপনার বুঝি এই বিদ্যে হয়েছে? ক্ল্যাসিক্সে শ্রদ্ধা নেই, নরকে যাবেন যে!

অশোক সরবে হেসে উঠলো, বললে, আমার কোনো কিছুতেই শ্রদ্ধা হয়নি বৌদি। পড়লুম আর কই? কিন্তু সে-কথা থাকগে। বিদ্যাপতি পড়বেন? আমার তো বেশ লাগে বিদ্যাপতি ঠাকুরকে।

যখন-তখন মুখে আঁচল দেওয়া মন্দার স্বভাব, সে মুখ চাপা দিয়ে খিলখিল

করে হেসে উঠলো, নিজের কানের দুল দুটোকে চমকে দিয়ে বললে, তা তো লাগবেই ; মিনির কতো বয়স হোলো—আঠারো না উনিশ ? তার দ্বিতীয় বয়ঃসন্ধি কাছিয়েছে কি না ! ভালো তো লাগবেই।

মানে ?

মানে নেই। আমার বেয়ারাটার আপনার চেয়ে বুদ্ধিশুদ্ধি আছে হাঁদারাম ! মন্দা বায়ুতে হিল্লোল তুলে সেখান থেকে চলে গেলো।

বেলা তখন প্রায় ন'টা বেজেছে। চক্ষুওয়ালা গ্রামখানি রোদে ঝলমল করছে। অশোক বাইরে থেকে শুনতে পেলে মন্দা তার সহজ উচ্চস্বরে প্রমোদকে ডাকছে—ওগো, ওঠো। আর কতো ঘুমোবে ?

রাতি পোহাইল ওঠো প্রিয়ধন
কাক ডাকে না যে করিবে শ্রবণ।
অশোকের কাছে নাই আর মিনি,
দুধ দিয়ে গেছে রাধা গোয়ালিনী
বাজারে চলেছে কতো পসারিনী—

কি জ্বালা গো ! তোমার জন্য আবার আজ যথাযোগে পদ্য রচনা করতে হোলো। উঠবে না নাকি ?

বাইরে অশোক আর থাকতে না পেরে গগন বিদীর্ণ করে হেসে উঠলো। মন্দা চঞ্চল চরণে বারান্দার দিকের পর্দা তুলে বেরিয়ে এসে কৌতুকভরা চোখ দুটি বড়ো বড়ো করে জিগগেস করলে, হাসছেন যে বড়ো ? মিনির মতো আমি কাদার তাল নিয়ে ঘর করিনে গো ঠাকুর ! এ বড়ো শক্ত ঘানি !

চা খেতে খেতে অশোক মাঝে মাঝে হেসে উঠতে লাগলো, তার গলায় একবার খাবার আটকে গেলো। সে মন্দার দিকে চেয়ে এক সময়ে বললে, একেই বলে সুপ্রভাত বৌদি, আপনার কল্যাণে আজ সত্যই সুপ্রভাত হোলো। বাপরে, কি কবিতা! কিন্তু সে যাকগে। প্রমোদ-দা চলুন আপনাকে আজ টেনিসের জায়গাটা দেখিয়ে আনি।

প্রমোদ উঠে দাঁড়িয়ে পাইপ ধরাচ্ছিলো। প্রথম টান দিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে বললে, রাইট। বসো একটু, দশ মিনিটে আসছি। সে স্নান-ঘরের দিকে চলে গেলো।

ভিতরে কোথাও ব্যারিস্টরপুত্র রঞ্জন সহজাত সংস্কারবশে দুধ খাবার বিষয়ে আয়াকে তর্কবাণে বিদ্ধ করছিলো। অশোকের কান সেই দিকে গেলো। মন্দা বললে, ও অশোকবাবু আমার দিকে কান দিন না! যেন বাড়ি পালাবেন না ওঁর কাছ থেকে। আমাকে নিয়ে যাবেন সঙ্গে করে, একবার মিনি পোড়ারমুখীকে দেখে আসবো—সে তো আর আসবে না! আর বইও দেখবো। উঠে দাঁড়িয়ে বললে, চললুম রান্নাঘরে। অশোকও উঠে দাঁড়ালো।

এপাশে এসে নিমেষের জন্য তার কাছে দাঁড়িয়ে মন্দা মৃদুস্বরে জিগগেস করলে, আর বেদনা নেই তো কোনোখানে? দুঃখ হয়েছে আপনাকে পরিশ্রম করিয়ে। তা না হলে দেখতেও তো পেতুম না সত্যিকার আপনাকে!

বাড়ি দুটো থেকে খানিকটা দূরে নাসপাতি-বীথির মাঝে প্রায় দুই বিঘে উঁচু কাঁকুরে জমি। খুব সমতল নয়, কিন্তু একটু চেষ্টা করলে সমতল করে

নেওয়া সম্ভব। মালীদের চৌধুরীও অশোকের কথায় সায় দিলে যে অতিবৃষ্টিতেও সেখানে কখনো জল দাঁড়ায় না। প্রমোদেরও স্থানটা পছন্দ হোলো। সে অশোকের কাঁধ চাপড়ে বললে, বেশ হবে। খরচ তোমার আমার হাফ অ্যাণ্ড হাফ, কি বলো? অশোক কিছু না বলে মৃদু হাসলে। প্রমোদ তো তখনই কল্পনায় খেলতে খেলতে দু'চারবার ব্যাকহ্যাণ্ড ড্রাইভ করার ভঙ্গীতে ডান পা'টা নটরাজের মতো হাঁটু মুড়ে বাঁ দিকে তুলে ডান হাতটা আন্দোলিত করলে। অশোক তার বালকসুলভ উৎসাহ আর চাঞ্চল্য দেখে হেসে উঠলো।

চৌধুরী খবর দিলে বাগানের কোথাও একটা পাথুরে বেলন পড়ে আছে। কোর্ট রোল করে সমতল করা শক্ত হবে না। অশোক বললে, আপনি একটু দাঁড়ান, প্রমোদ-দা, আমি এখনি আসছি। সে বাড়ির দিকে দৌড় দিল।

মিনি হলঘর দিয়ে কোথা যাচ্ছিল। অশোক তাকে একটা উড়ো-চুমো খেয়ে জিগগেস করলে, মা কোথা মিণ্টি? কিন্তু তার উত্তরের কোনো অপেক্ষা না করে সে ভাঁড়ারে চলে গেলো। কাত্যায়িনী তরকারি কুটছিলেন, মুখ তুলে জামাতার দিকে চেয়ে দেখলেন। অশোক একটা নিচু মোড়ায় বসে পড়ে জিগগেস করলে, মা, নাসপাতি বাগানের ও খালি জমিটায় আপনার কোনো দরকার আছে?

না, কেন?

তাহলে ওখানে একটা টেনিস-কোর্ট করি, করবো?

তোমার শ্বশুর ওখানে কোর্টই গড়বেন ঠিক করেছিলেন—বন্ধু অতিথিদের

জন্য। সে ইচ্ছা আর পূর্ণ হয়নি। এখনো গুদামঘরে বোধ করি সিমেণ্ট আর জাল ইত্যাদি রাখা আছে। করিয়ে নাও না কোর্ট। বলে রাখা ভালো, অশোকের শ্বশুর অকালে অবসর নিয়ে ফার্মিং করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর বয়স বেশি হয়নি। বছর চারেক পূর্বে পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়েছিলো। অশোক তেমনি দৌড়ে প্রমোদের কাছে ফিরে গেলো।

প্রমোদ সিমেণ্ট করে পাকা কোর্ট করার কথাটা বাতিল করে দিলে, তাহলে এ-যাত্রায় আর খেলা হয় না, অশোক। এখন বজরি কোর্টই হোক, দিন চার-পাঁচে হয়ে যাবে বোধ করি।

সেইক্ষণ থেকেই মালীর দল কোর্ট তৈরি করতে লেগে গেলো।

অশোক গোটা কয়েক পাকা নাসপাতি পাড়িয়ে কোঁচায় বেঁধে নিয়ে প্রমোদের সঙ্গে গেলো। মন্দা প্রস্তুত হয়েই ছিলো। একটা নাসপাতি রঞ্জুর হাতে দিয়ে বাকিগুলো বেয়ারার ফলের টুকরিতে সমর্পণ করে সে প্রমোদকে বললে, ওগো, আমি চললুম ও-বাড়ি, মিনিদের লাইব্রেরি ঘাঁটতে। তুমি নেয়ে নিও, কেমন? আমার বেশি দেরি হবে না।

অশোক ছাতাটা মন্দার মাথার ওপর বাড়িয়ে দিলে। ওরা ফটকের কাছে যেতে প্রমোদ একটু উচ্চৈস্বরে বললে, মন্দা, ব্রিং সামথিং ফর মি। ডিটেকটিভ, বুঝলে—ডিটেকটিভ, অ্যাণ্ড নো আদার। গেবোরিও পাও তো দেখো হে অশোক!

ওরে মুখ্যু মিনি, তোদের বই দেখতে এলুম আজ। আমার তো ভাই আর হ্যামক নেই! কাজেই পড়ে-ই মরি! কি বলিস?

হ্যামক একটা টাঙাবেন, মন্দাদি? আমাদের গোটা দুই-তিন বাড়তি আছে।

মন্দা তার গাল টিপে ধরে বললে, চুপ কর রাক্কুসী। হ্যামক দুলিয়ে দেবার লোক ভাড়া করতে যাবো নাকি? কে দোলাবে? এখনো পান দিলিনি? আর আসবো না তোর বাড়ি, জব্দ হবি।

মিনি সহাস্যবদনে পান আনতে চলে গেলো।

কেতাব-কামরায় যেতে যেতে অশোক প্রশ্ন করলে, ও বৌদি, সত্যি দেবো নাকি আপনাকে একটা হ্যামক টাঙিয়ে? বলুন না?

মন্দা ঘাড় ঘুরিয়ে আয়ত চক্ষে চেয়ে বললে, আপনি দেবেন? আচ্ছা, দেবেন তাহলে।

অশোক বিদ্যাপতি নামিয়ে রাখলে আগেই। মন্দা যেখানে দাঁড়িয়েছিলো সেখানে সংস্কৃত গ্রন্থাবলী। এখানা-ওখানা দেখতে দেখতে তার ভর্তৃ-হরিতে হাত পড়লো। বৈরাগ্য নীতি শৃঙ্গারশতক একসঙ্গে বাঁধানো। সে বললে, আপনি তো সংস্কৃত পড়েছেন। আমাকে পড়াবেন একটু। আমি সব ভুলে গেছি। ও অশোকবাবু?

পাগল নাকি! আমি পড়াবো সংস্কৃত! অশোককে সংস্কৃত পড়তে হয়েছিলো। বৈরাগ্য নীতিশতক তার পাঠ্য ছিলো, কিন্তু তা ওষুধ-গেলা করে পড়ে সে টিকা টিপ্পনী ও ইংরাজি হিন্দি অর্থ সাহায্যে শৃঙ্গারশতকটি নিজের প্রেরণায় আগ্রহ করে পড়েছিলো। কিছু বললে না সে। মন্দা বললে, এটা নিলুম। অশোক তার হাত থেকে বইটা নিয়ে ফুঁ দিয়ে ধুলো ঝেড়ে টেবিলে রাখতে গেলো দু-পা এগিয়ে। ফিরে এসে দেখলে মন্দা

অমরুশতকের পাতা ওলটাচ্ছে। মন্দাদের চক্ষুওয়ালা আসবার আগে অশোক ঠুকরে-ঠাকরে অমরু পড়েছিলো। মনে পড়ে গেলো মিনিকে সে নীবিবন্ধমোচন করার কয়েকটা শ্লোকের অনুবাদও শুনিয়েছিল। সে লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠলো। মন্দা তার দিকে না চেয়ে বইয়ের শেল্‌ফে দৃষ্টি আবদ্ধ রেখে পিছন দিকে বইটা বাড়িয়ে বললে, এটাও রাখুন।

ও বৌদি, হাতজোড় করছি আর ভয় পাওয়াবেন না। আপনার কাণ্ড দেখে আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেছে। বিদ্যেকে আর বিদ্বানকে আমি মারাত্মক রকম ভয় করি। আপনার সঙ্গে ভাব আমার এখনি চিড় খেয়ে গেছে। আমাকে অভয় দিন। এদিকে আসুন লক্ষ্মিটি। এই দেখুন ডিকেন্স, হার্ডি, স্কট, ফরাসী লিখিয়ের দল। ডিকেন্স পড়বেন? লেখক-দের রাজা।

মন্দা হাসছিলো, মাথা দুলিয়ে বললে, মোটেই পড়বো না। শরৎবাবুর তবু দু-দশজন ভদ্রলোক নিয়ে কারবার আছে, ডিকেন্স সে ধারও মাড়ায় না। ইতরসংসর্গ করতে পারবো না বাপু! অশোকের ডিকেন্স খুবই ভালো লাগতো, মন্দার কথায় সে স্তম্ভিত হয়ে গেলো।

মিনি এলো পান নিয়ে। মন্দা বললে, আমার মুখে দিয়ে দে ভাই, হাত দুটো ধুলোয় ভরে গেছে।

অশোক উঁচু থেকে একটা বই নামিয়ে বললে, এই দেখুন টলস্টয়—ওয়ার অ্যাণ্ড পীস, নেবেন? আমি পড়িনি যদিও।

আমি পড়েছি। কিন্তু ওটা কি? ক্রয়ট্‌জর সোনাটা? দিচ্ছেন না যে? দিন?

মিনি মন্দার কাণ্ড দেখে আতঙ্কে এক পা এক পা করে পিছিয়ে স্থানত্যাগ করলে।

মন্দা দু'হাতে লোটাস্ লাইব্রেরির গাঢ় বেগুনি মলাটের পাতলা বইগুলো নিয়ে টেবিলে এসে বসলো। বোঝাটাকে পাশের দিকে বাড়িয়ে ফুঁ দিয়ে দিয়ে টেবিলের উপর রাখলে। এই যে ওর জন্য একখানা গেবোরিও পাওয়া গেলো, বাঁচলুম। মাদাম বোভারি পড়বো না কি? আচ্ছা! অশোক জানতো না মাদাম বোভারি কি বস্তু। আর একটা বইয়ের মন্দা পাতা ওলটালো। প্রথম পাতাটা একটু পড়ে বইটা মসৃণ টেবিলের ওপর দিয়ে অশোকের দিকে ঠেলে দিলে। অশোক পড়লে, বইটার নাম স্যাফো, অ্যালফঁস দোদের লেখা। প্রথম পাতার প্রথম দুটি লাইনে মন্দা আঙুল বুলিয়ে গেলো—'আই লাইক দি কালার অভ ইয়োর আইজ, হোঅট্‌স্ ইয়োর নেম?' চক্ষে বিজলী হেনে খুব মৃদুস্বরে জিগগেস করলে, নাম জিগগেস করবো নাকি আপনার? ও অশোকবাবু? তারপর খিল খিল করে হেসে উঠলো। যেন হঠাৎ সাপ দেখার মতো অশোকের সারাদেহ রোমাঞ্চিত হোলো। মন্দা, এটাও নিলুম, বলে উঠে দাঁড়ালো। ও অশোকবাবু, দিন না আমার মুখে দুটো পান ফেলে!

আমার হাত ভীষণ নোংরা বৌদি, মিনিকে ডাকছি। শার্দূল-ভয়ে ভীতের মতো অশোক তৎক্ষণাৎ ঘরের বাইরে গেলো। অতি উচ্চকণ্ঠে ডাকলে, মিনি, মিনা, মিন্টি। ডাকা নয় যেন আর্তস্বর, যেন শরণ চাওয়া—দুর্গা, দুর্গা—শিব, শিব। সেদিন পর্যন্ত অশোকের মিনিকে ডাকা কাত্যায়িনী শুনতে পাননি। আজ যেন বাগানের ওপার পর্যন্ত তার কণ্ঠস্বর পৌঁছলো।

মিনি এসে মন্দাকে পান খাইয়ে দিয়ে হাত ধুতে নিয়ে গেলো। অশোক হাতমুখে জল দিতে দিতে নিজেকে প্রশ্ন করছিলো, বৌদিকে নিয়ে আমি কি করবো! ছাড়তেও পারিনে। রাখতেও পারিনে। আমি কি করবো? দুর হোকগে হ্যামক!

কিন্তু বাইরে এলো সব চেয়েও ভালো রেশমে-বোনা হ্যামকটা নিয়ে—যেটা মিনিকে দিতেও মন উঠতো না তার।

ভয়ের উৎপত্তিমূল উদ্দীপনা অসংখ্য। 'অনুরাগভয়েন ভীতঃ' যে তার ভয় পরমাশ্চর্যের। দুপুরবেলা অশোক নিদ্রিতা মিনির পাশে শুয়ে শুয়ে মন্দার কথা ভাবতে লাগলো। নির্ণয় করতে পারলে না মন্দার লক্ষ্য কি। তার এ কি শুধু চটুলতা, শুধু কি মারাত্মক খেলা, না আর কিছু? সকালে সে ভেবেছিলো মন্দাকে দূরে পরিহার করবে, সে সঙ্কল্প আর অশোকের মনে এলো না। অন্তরীক্ষে চুম্বক আকর্ষণ করছিলো। অশোক ভাবলে, ও অর্থপূর্ণ চোখের দিকে আর চাইব না, তার মর্মভেদী দৃষ্টিকেও আর গ্রহণ করবো না নিজের অন্তরে। হঠাৎ সে ছেলেমানুষের মতো উত্তেজিত হয়ে বিছানায় উঠে বসলো, নিজেকে বললে, বেশ হয়েছে, লক্ষ্মণের মতো ব্রতী হই না কেন? লক্ষ্মণ সীতার মুখের দিকে চাইত না, আমিও চাইব না বৌদির মুখের দিকে।

বিকেলে খেলতে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে অশোক মিনিকে বললে, চলোনা লক্ষ্মিটি। খেলতে শিখলে আমি তোমাকে বাইরেও পাবো, সেখানেও কোনো ফাঁক থাকবে না তোমার বিষয়ে।

মিনি বুঝলে সে কথা। স্বামীর কাছটিতে সরে এসে বললে, পারবো না যে, আমাকে তুমি মাফ করো। সাহস তৈরি করে নি আগে, তারপর দেখো তুমি না ডাকতেই যাবো, কেমন ?

অশোক র‍্যাকেটটা বগলে দাবিয়ে দুহাতে মিনির সমস্ত মুখটা ধরে নাড়া দিয়ে বললে, মঞ্জুর তোমার কথা, কিন্তু মনে থাকে যেন। আজ থেকেই সাহসের ডাম্বেল ভাঁজতে আরম্ভ করে দাও।

কাঞ্জিলালদের কাঠের পুতুল বেয়ারাটা যেন সর্ববিদ্যাবিশারদ। এই কিছুদিনে অশোক আবিষ্কার করেছিলো লোকটার ধোয়াপোঁছা ভাবশূন্য মুখ দেখে কিছু বোঝবার যো না থাকলেও তার নিঃশব্দ কর্মপটুতা আশ্চর্যজনক। ব্যাডমিণ্টনের কোর্টটি নিখুঁত করে চুনের রেখাঙ্কিত। বেয়ারাটা কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলো, অশোক প্রীত হয়ে জিগগেস করলে, তুম্‌নে তৈয়ার কিয়া কোর্ট ? কাষ্ঠপুত্তলি শুধু বললে, হুজুর। তার দক্ষিণ হাতটা কপাল স্পর্শ করলে। অশোক তাকে ভেতরে খবর দিতে বলে মাঠের পাশে একটা বেতের কেদারায় বসলো।

প্রমোদের পিছনে এলো মন্দা। আঁচল কোমরে দৃঢ় করে বাঁধা। উর্ধ্বাঙ্গে বসনও দৃঢ় করে জড়ানো। তাকে দেখাচ্ছে সুমধ্যা বন্ধুরগাত্রী। অশোক চোখ নামালে।

প্রমোদ জিগগেস করলে, তিনজনে কি রকম হবে হে ?

আপনারা দুজনে একদিকে হোন।

মন্দা নেটের ওদিকে যেতে যেতে বললে, ও অশোকবাবু, অতো সাহস ভালো নয় কিন্তু। আমি আনাড়ি নই তা বলে রাখছি।

বেশ তো বৌদি! আপনার কাছে পরাজয়ের আনন্দ তো সুলভ নয়।

প্রমোদ বললে, সাবাস অশোক! মন্দার গুণে ইউ আর ইম্প্রুভিং; কম্প্লিমেণ্ট দিতে বেশ শিখছো।

সে-কথার উত্তরে অশোক হাসলে। হঠাৎ মন্দার পায়ের দিকে নজর পড়তে সে বলে উঠলো, ও বৌদি, জুতো পরেননি যে? অসুবিধে হবে কিন্তু!

মাথা দুলিয়ে মন্দা বললে, না, হবে না। পায়ের তলায় দুর্বো ঘাসের ছোঁওয়া, তৃণাঙ্কুরের অনুভূতি আমার খুব ভালো লাগে। চাণক্য পণ্ডিতের মতো আমার তৃণাঙ্কুশের ওপর কোনো রাগ নেই তো! আর ভালো লাগে খেলার পর ধুলো-মাখা পা ধুতে।

স্টপ ইওর কাব্যি, মন্দা। এবার আরম্ভ করা যাক।

ও অশোকবাবু, আমি কিন্তু ওভারহ্যাণ্ড সার্ভিস করি; হাসবেন না যেন। এই নিন। অশোক মন্দার বৈচিত্র্যে হাসতে গিয়ে পয়েণ্ট খোয়ালে।

সে ক্ষিপ্র দুর্ধর্ষ, তাহলেও এই কুশলী দম্পতিকে বেশিক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারলে না। অশোক পয়েণ্ট খোয়ায়, আর মন্দা কলকণ্ঠে হেসে ওঠে। দুটো গেমই অশোক হারলে। প্রমোদ ঘর্মাক্ত হয়ে বসে পড়লো, বললে, মন্দা, ইউ গো অন ইফ ইউ ওয়ণ্ট টু।

এইবার একা পেয়ে শোধ তুলবেন না তো? ও অশোকবাবু!

অশোক মন্দাকে কোর্টের সর্বত্র দৌড় করাতে লাগলো, ক্রমশ মন্দার মুখের হাসি মিলিয়ে গেলো, সে গম্ভীর হয়ে উঠলো খেলার উত্তেজনায়

আগ্রহে। অশোক মনে মনে হাসলে। পরাজয়ের ষোলআনাটুকু মন্দার কাছ থেকে আদায় করে নিতে তার মায়া করতে লাগলো। অবশেষে সে হারলো নিজেই—এক পয়েণ্টের হার, কাঁটায় কাঁটায় খেলে। মন্দাকে জানতেও দিলে না যে তার পরাভবটা ইচ্ছাকৃত।

শুক্লা দ্বাদশী সন্ধ্যা। খেলা শেষ হবার আগেই চাঁদ উঠেছিলো। বারান্দার সামনে শান-বাঁধানো চত্বরে কুর্সি পাতা, অশোক বসলো। প্রমোদ ভেতরে গেলো স্নান করতে। মন্দা একটা আসনের পিঠ ধরে দাঁড়িয়ে বললে, উনি এলেই আমিও যাবো দু'মিনিটের জন্য। আপনি কিন্তু বাড়ি যেতে পাচ্ছেন না, গেলে মিনির ফাঁদে পড়ে যাবেন, আর ফিরবেন না। এখানেই বরং হাতমুখ ধুয়ে নিন। কি খাবেন বলুন, শরবৎ, চা, না কফি?

আপনি যা খাবেন তার প্রসাদ দেবেন বৌদি।

মন্দা অপাঙ্গে চেয়ে খিল খিল করে হেসে মুখে হাতের উল্টো পিঠটা চাপা দিলে। তারপর বললে, প্রসন্ন হলুম। কফির প্রসাদ দেবো। আমি বড্ডো কফি খাই।

ও বৌদি, বলব? অশোক মন্দার মুখের দিকে না চাইবার সঙ্কল্প করে ভুলে গিছল। অজন্তার একটা ফ্রেস্কোর নকল দেখেছিলুম একবার। আপনাকে যখন দৌড় করাচ্ছিলুম সেটা মনে পড়ে গেলো। ফ্রেস্কোটা যেন আপনারই নানা ভঙ্গিমার।

রঙ ধরেছে গো! বলে মন্দা দৃঢ়বসনে-বন্দী সমগ্র দেহটি লীলায়িত করে

ভেতরে চলে গেলো। দূর অন্ধকার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে স্বর উচ্চ করে বললে, আর পালাবেন না জানি, তবুও বলে যাচ্ছি।

অশোকের কান দুটি উষ্ণ হয়ে উঠলো। মনে মনে নিজের গণ্ডে চপেটাঘাত করে সে বললে, দূর ছাই, না বললেই হোতো ও কথা।

প্রমোদ এলো। বেয়ারা আরাম-কুর্সির সামনে পা রাখবার জন্য একটা মোড়ার ওপর কুশন দিয়ে গেলো। ডান দিকে একটা তেপায়া রাখলে, তার ওপর সাজিয়ে দিলে স্বর্ণাভ পানীয়-ভরা ছোট একটা ডিক্যাণ্টর, সোডা-সাইফন, তামাকের পাউচ, পাইপ। গেলাশের পাতলা ডাঁটিটি ধরে প্রমোদ অশোককে বললে, যখন এসব শেখবার ইচ্ছা হবে আমাকে বোলো হে! আই শ্যাল টিউটর য়ূ।

নবদূর্বাদলশ্যামা মন্দার অঙ্গে বাসন্তী-রঙের কুলহারা বন্যা বইতো কিন্তু চওড়া গভীর রক্ত-রাঙা পাড় সে বন্যাকে তার সুঠাম দেহে ধরে রেখেছে। ললাটে ত্রিনয়নের মতো জ্বলজ্বল করছে সিঁদুর টিপ। অশোক অপলক চেয়ে রইলো মন্দার দিকে। তার সম্বিৎ ফিরে এলো বেয়ারা যখন ধূমায়মান কফি তার সামনে আগিয়ে দিলে।

প্রমোদ ধীরে ধীরে দুটি গেলাশ পানীয় শেষ করে পাইপ ধরালো। কয়েকবার টেনে মন্দাকে বললে, সিং টু অস্, ডিয়র। কি বলো মন্দারানি, গাইবে?

অশোকের মনে নতুন একটা প্রত্যাশা জেগে উঠলো। প্রমাদ জাগাতে পারে নাকি এ যাদুকরী? মন্দা হেসে বললে, গাইবো তো, কিন্তু অশোকবাবুর মাথা গুলিয়ে যাবে না তো?

প্রমোদ হাততালি দিলে, বেয়ারা এসে দাঁড়ালো। প্রমোদ বললে, এস্রার। লাল আবরণ থেকে মুক্ত করে বেয়ারা যন্ত্রটি প্রমোদের হাতে দিলে। সেটা ঠিক করে নিয়ে সে ছড়ি টানলে; গুনগুনিয়ে উঠলো রাগিনী। মন্দা গান ধরলে সুরকে অনুসরণ করে। অশোক হারিয়ে গেলো গানে, সুরে, গায়িকার রূপে লাস্যে ভঙ্গীবিলাসে।

'যমুনা জলে ডারো কুসম কী হার।
বিফল বিফল সখি বিফল সিঙার।
বিফল ভামিনী জাগল যামিনী,
বিফল মধুপান, গজবরগামিনী।
কামিনী কামনা বিফল তুহার।
নাগর নটোবর, নাগর নটোবর ন আওল আর।'

অশোক অপলক-নেত্রে গায়িকার মুখের দিকে চেয়েছিলো। মন্দার তন্দ্রালু নয়ন, স্ফীত নাসারন্ধ্র, তার স্বরশাসনের ওষ্ঠলীলায় অশোকের দৃষ্টি আটকে গিছলো। গান শেষ হতে মন্দা অশোকের দিকে প্রখর দৃষ্টিতে চেয়ে জিগগেস করলে, ও অশোকবাবু, ভালো লাগলো নাকি? অশোক কোনো উত্তর দিলে না, কেবল তার মুখে হাসি ফুটে উঠলো একটু। প্রমোদ ততক্ষণে হাতের বাজনাটা সরিয়ে রেখে চোখ নিমীলিত করে কেদারায় হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ছিলো। চোখ না খুলেই বললে, অশোক, বাড়ি না যাও তো আর একটা গান হোক।

অশোক উঠে পড়ে বললে, আজ আর নয়, চললুম। ও বৌদি, যাই এইবার।

যাবেন ? আচ্ছা। চলুন ফটক পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি।

কৃষ্ণচূড়ার ছায়া ছাড়িয়ে ফটকটা ওদিকে। পাশে যেতে যেতে মন্দা কোনো কথা কইলে না। তার গানের ঝোঁক তখনো যায়নি, আপন মনে সে গুনগুন করছিলো, হঠাৎ আধফোটা স্বরে সে গেয়ে উঠলো—

গোরে গোরে মুহা পর' বেশর শোহে
অওর শোহে নয়না কাজরা রে—

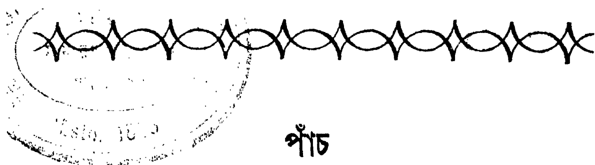
আকাশে বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো বাগেশ্রীর মূর্চ্ছনা ঝলক দিয়ে গেলো। মন্দা দু'হাতে ছোট এক-পাল্লার ফটকটা ধরে দাঁড়ালো, অশোক থামলো রাস্তায়। মন্দা মুখ তুলে বললে, আজ আরও গান শুনতে চাইলে বোধ হয় এইটাই গাইতুম। তার মুখ ছিলো চাঁদের দিকে। অশোক প্রথম লক্ষ্য করলো মন্দার আয়ত-নয়নে সুর্মা টানা। সিঙার বিফল বটে, মনে হোলো তার। প্রমোদের বোধ হয় ততক্ষণে আরো দু'পেগ ক্ষুধাকারক অ্যাপেটাইজার চড়েছে। অশোক চট করে হাতদুটি কপালে ঠেকিয়ে বললে, চললুম বৌদি, নমস্কার।

মন্দাও ফিরলো ঘরের পানে। হঠাৎ হাতের পাতা দুটো উলটিয়ে দিয়ে সে আবার গুনগুনিয়ে উঠলো, কামিনী কামনা বিফল তুহার। গানের প্রকাশ বচনাতীত।

চাতালে উঠে প্রসারিত-দেহ প্রমোদের দিকে চেয়ে বললে, ওগো, চলো এবার খেতে যাই। বাড়ির দিকে মুখ তুলে স্বর উচ্চ করে বললে, বেয়ারা, খানা পরসো। উঠবে না নাকি ? ওগো! ডিক্যাণ্টরে প্রায় তলানি,

ছ' পেগ ধরে সেই পলকাটা কাঁচের আধারটায়। আবার হাত উল্টে মন্দা অস্ফুট নিষ্ফল স্বরে বলে উঠলো, যাকগে।

চাঁদের নিদ্রা নেই, চন্দ্রাহতেরও নেই। মিনি গভীর নিদ্রামগ্ন। অশোক মাথার পিছনে অঙ্গুলিবদ্ধ দুই হাত রেখে খাটের মাথায় ঠেসান দিয়ে মুদিত চোখে বাস্তব-কল্পনায় মেশানো এক বিচিত্র চলচ্চিত্র দেখছিলো —মধুপানশ্লথ কুঞ্জরগামিনী ললনা, সে ললনা মন্দা ; যেন নিবিড় করে সে অশোকের কাছে এসে দাঁড়াচ্ছে, আবার প্রতিহত হয়ে ফিরে যাচ্ছে। আসা যাওয়া তার বার বার।



পাঁচ

সমগ্র মানুষ তার মনোবৃত্তির নানা স্ফুরণের এক সুতোয় গাঁথা একটি সম্পূর্ণ মালা। কোনো একটি-মাত্র স্ফুরণ তার সমগ্রতার সম্পূর্ণতার পরিচয় নয়। বৃত্তি তার কখনো যেন উচ্চ শিখরাসীন কখনো বা উপত্যকায় গড়িয়ে পড়ে। আবেষ্টন যার যেমন মানসিক ক্রিয়ার প্রসার তার তেমনি। মনে হয় এই প্রসারের, মনের উচ্চাবচ পরিক্রমার কোনো নির্দিষ্ট পরিধি নেই, ভালো মন্দ কিছুই তার একমাত্র নিয়ামক নয়। ভালো বা মন্দ বলে আমরা যাকে মূল্য দি তা আমাদের মনোবৃত্তির স্বরূপ, যাতে যেটা স্ফুট হয়ে ওঠে. নৈসর্গিক কারণ হয়তো তার আছে; থাকে যদি তা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

মন্দা যখন ফ্রক পরে বেড়াতো তাকে ঘিরে ছিলো ঘরের সঙ্গীতসাধনা, কলাচর্চা বৈদগ্ধের নিরন্তর প্রয়াস। তার বাপ ছিলেন সেকালের ঐশ্বর্য-শালী জমিদার। ধন মানুষের অপরিমিত থাকতে পারে কিন্তু সকল ধনীর ভাগ্যে ঐশ্বর্য জমে ওঠে না; ঐশ্বর্য ধনাতীত বস্তু। তাঁর ধন-শীলতার মাপ ছিলো, ঐশ্বর্যের ছিলো না। তাঁকে ঘিরে থাকতো একদিকে গান, বাইজীর নৃত্য ও সুরা; অন্য দিকে তাঁর ছিলো সংস্কৃত ও গ্রীক কাব্যচর্চা। বায়রনের দ্যুতি তাঁকে যেন আবৃত করে রেখেছিলো। 'যমুনা জলের' আর 'গোরে গোরে' মুখের গান মন্দা আপনি আয়ত্ত

করেছিলো বাপের সঙ্গীতরসিক এক সাথীর স্বরব্যঞ্জনা থেকে তার আট-ন' বছর বয়সে। বাড়িতে বেদনাবোধবিহীন সঙ্গীত, মাত্র ব্যাকরণসিদ্ধ ওস্তাদের স্থান ছিলো না, ছিলো প্রকৃত সঙ্গীতরসিকের যাদের সঙ্গীত প্রকাশের পরিমাপ ছিলো, পরিবেশনে ছিলো সংযম। সেই কাল থেকেই শুদ্ধ স্বর ও বাণী মন্দার মনকে ওতপ্রোতভাবে ঘিরে রেখেছিলো।

বন্ধ দুয়ারের আড়ালে লক্ষ্ণৌ লাহোর কলকাতার তয়ফা নাচতো, তাদের যেটুকু নুপূরশিঞ্জন বাইরে ভেসে আসতো সেইটুকু মন্দার সর্বাঙ্গে কাঁটা জাগিয়ে দিতো, তার হৃদস্পন্দনে জাগতো চঞ্চল ছন্দ। নিধুবাবু, নিরঞ্জন বা গালিব তো গানের অঙ্গ, মন্দা তার পিপাসিত শ্রুতি দিয়ে সে সকলের অতি সূক্ষ্ম রূপলাবণ্যমধুর স্বরপর্যায়গুলি নিছক সংস্কারের দ্বারা নিজের অন্তরে গ্রহণ করতো। নৃত্য সে চাক্ষুষ করেছিলো মাত্র একটি বার। গভীর রাত্রে জলসাঘরের একটা নির্জন দিকের দরজায় নুপূরশিঞ্জনের লাস্যে আকৃষ্ট হয়ে চোখ রেখে দেখেছিলো সুর্মাটানা লাহোরী তয়ফার নৃত্যমাতাল ছন্দচঞ্চল, আনন্দময় দেহের বিবসন নৃত্য। মন্দার বয়স তখন বারো। নিজের দেহে তার বন্ধুরতার সবেমাত্র প্রভাত আলো, মনে নূতন একটা অস্পষ্ট অনুভূতির প্রারম্ভ। সে রাত্রের নৃত্য তার মনের মালায় আটকে গেলো। মনে তার নিজের দেহের সম্ভাবনার সম্বন্ধে চেতনা জাগলো।

অপর দিকে মন্দার কানে আসতো তার বাপের কাছে গৃহপণ্ডিতের সরস অধ্যাপনা। ঋতুসংহার, কুমারসম্ভব, ভর্তৃহরি গম্ভীর মাধুর্যে ঝঙ্কার দিয়ে বেড়াতো। বাপের পাঠকক্ষে গুঞ্জরণ করতো মন্দাক্রান্তা মালিনী

স্রগ্ধরা। কখনো কখনো বাপ একলা থাকলে আপন মনে আবৃত্তি করতেন স্যাফো, অ্যানাক্রিয়ন, এস্কাইলস্ ইত্যাদির মূল রচনা অথবা ইংরাজি ভাষান্তর। মন্দা বইয়ে পড়েছিলো—ফর্ গ্রীস এ লাই অ্যাণ্ড গ্রীকস্ এ টিয়র। পিতার আবৃত্তিমগন কণ্ঠস্বরে বাক্যটার অর্থ অল্পে অল্পে ছায়ামুক্ত আলোর মতো ফুটে উঠতো তার মনে।

পিতার একাগ্র নিষ্ঠার ছবিটি মন্দার চোখে অবিরাম পড়তো। তাঁকে সে কোনোদিন গান গাইতে শোনেনি কিন্তু তাঁর হাতের সেতার-গুঞ্জন শুনতো মাঝে মাঝে যখন তিনি নিভৃতে থাকতেন। তিনি বারকয়েক য়ুরোপ ঘুরে এসেছিলেন; কিন্তু আশ্চর্য এই যে, সাহেবিয়ানার সেই অত্যুগ্র কালেও তিনি য়ুরোপের কিছুই ঘরে এনে তোলেননি—না পররুচি, না কোনো বিলিতি বিলাস আবর্জনা। মন্দা কোনোদিন তাঁকে ইংরাজি কাপড় পরতে দেখেনি। অধিকাংশ সময়ে তিনি মোগলাই পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে থাকতেন। বৈদগ্ধ নিজস্ব উত্তরাধিকারের আর নিজের দেশের সুপরিচিত বস্তুর মূল্য বাড়ায়, পরদ্রব্যে পরের আচার ব্যবহার অনুশীলনে মানুষকে সন্দিহান করে। মন্দার পিতার বৈদগ্ধ-পরিশীলিত মনে বিদেশী বা বিজাতীয় কিছুর তিলমাত্র স্থান ছিলো না। তাঁর মতো সহজ সম্ভ্রমশীল মানুষ ছিলো বোধ হয় সে-কালের সমাজের প্রতীক। সে কালও নেই, সে ধরনের মানুষও আর গড়ে ওঠে না।

আর একটি ব্যাপার মন্দার চোখে পড়তো। ঘড়ি ধরে রাত্রি সাড়ে আটটার সময়ে তাদের বাড়ি পিতার প্রসাধন-সৌগন্ধে ভরে উঠতো। কাঁটায় কাঁটায় রাত্রি ন'টার সময়ে তাঁর জুড়ি-গাড়ি গলি কাঁপিয়ে বার

হয়ে যেতো, মোড়ের মাথা থেকে শোনা যেতো জোড়া তীক্ষ্ণ গলায় সহিসেরা পথিককে সতর্ক করছে—সামনেওয়ালা হটো। বিচিত্র ছিলো সে-কালের কলকাতার সে রব। সে রব ছিলো ধনী অ্যারিস্টোক্র্যাটের পরিভ্রমণের সাথী। আবার কাঁটায় কাঁটায় রাত্রি তিনটের সময়ে গলিতে আরবী অশ্বযুগলের গর্বিত তেজোদ্দীপ্ত পদধ্বনি মুখর হয়ে উঠতো। সহিসেরা হাঁকতো না সে নিশুতি রাত্রে কিন্তু সে শব্দে এক-এক রাত্রে মন্দার ঘুম ভেঙে যেতো।

মন্দা লোরেটো স্কুলে পড়তে যেতো। বাড়িতে সঙ্গীত শিক্ষা করতো; বোধ করি জন্মগত সংস্কারের গুণে সে স্বরসিদ্ধি লাভ করেছিলো। অধ্যাপক তাকে সংস্কৃত বাংলা পড়াতেন। বয়স বাড়লে বাপ ডাকতেন কাছে, সে পড়ে শোনাতো রামায়ণ মহাভারত মেঘনাদবধ তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য; মাঝে মাঝে তাকে রঘুবংশ শকুন্তলা ইত্যাদিও পড়তে হতো। বাপ গাইতে বাজাতে বলতেন কখনো কখনো। এইখানে ছিলো মন্দার ভয়, পড়ায় ছিলো না। পিতাকে সে সঙ্গীতের দেবতা বলে ধরে নিয়েছিলো। বাজাতে হাত যেতো কেঁপে, গাইতে গেলে স্বর আয়ত্তের পথ ছাড়িয়ে যেতো। তিনি মন্দার ভয় দেখে হাসতেন। এ-ভয় তার কোনোদিন ভাঙেনি। গানে খুশি হলে তিনি দেরাজে হাত পুরে দিয়ে না দেখে না গুণে মুঠিভরা অর্থ গায়ককে দান করতেন। মন্দা প্রীতির সে অর্ঘ কোনোদিন লাভ করেনি।

রঙেরও আমেজ কিছু তার মনে জেগেছিলো, যদিও হাতে-কলমে তার সেদিকে অগ্রসর হবার সুযোগ হয়নি। স্কুলে ছবি আঁকতে শেখাতো।

ফল-মূল পশু চিত্র করার গণ্ডি ছাড়িয়ে মন্দা দু'চারখানা ল্যাণ্ডস্কেপ একেছিলো। কিন্তু সে সকলের কেউ কোনোদিনই ভালো বা মন্দ কোনো সমালোচনাই করেনি। আর যাই হোক না কেন সে জলের রঙ ও তৈলের রঙ দুইই কিছু ব্যবহার করতে শিখেছিলো। কিন্তু তার সহজ প্রবণতা ও ঝোঁক ছিলো রান্নায়। কোমরে আঁচল জড়িয়ে সে মা ও রাঁধুনির কাছে শিক্ষানবিশী করতো। আবার বাহির মহলেও কখনো চাটগেঁয়ে কখনো গোয়ানীজ পাচক—যে যখন থাকতো তার বিদ্যা ও কৌশল আয়ত্ত করে নিতো। কিশোর বয়স থেকেই মন্দার রন্ধনের টেক্‌স্ট-বুক লেখবার প্যাশন ছিলো।

কলকাতার অট্টালিকার অরণ্যে প্রজাপতির আনাগোনা অভাবনীয় ব্যাপার। হঠাৎ একদিন মন্দাদের অঙ্গনে বেল-জুঁই বীথিকায় প্রজাপতির আনাগোনা আরম্ভ হলো। প্রজাপতির সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ হয়তো বা লৌকিক, হয়তো বা বালসুলভ সংস্কার। কাকতালীয়ের মতো বিচিত্র সুন্দর পতঙ্গের আনাগোনা যেন হঠাৎ সফল হোলো। বাড়িশুদ্ধ লোক শুনতে পেলে মন্দার বিবাহ আসন্ন। সে তখন পঞ্চদশী, যৌবনের তোরণে পা দিয়েছে। প্রমোদের সঙ্গে একদিন তার বিয়ে হয়ে গেলো।

প্রমোদ ব্যারিস্টর। তার বাপও ছিলেন যুক্তপ্রদেশের নাম-করা আইন-জীবি। বিয়ের কিছুকাল পরে মন থিতোলে মন্দা দেখলে প্রমোদ কাছারি যায়-আসে বটে কিন্তু আইনের ব্যবসায়ে তার কোনো মায়া নেই, প্রমোদই বলতো মায়া হবার মতো ঘটেনি কিছু। তার মাথায় নানা রকম মতলব ঘুরে বেড়াতো যার সঙ্গে আইনের ব্যবসার কিছুমাত্র

কোনো সম্পর্ক ছিলো না। যন্ত্র আর যন্ত্রগত ব্যবসা তার মনকে টানতো, কিন্তু তা করবার মতো প্রমোদের অর্থ ছিলো না এবং ভাগে কারবার করবার তার স্পৃহাও ছিলো না। প্রমোদ কিন্তু সেই সকলের দিবাস্বপ্নে এবং সোমরসে তন্ময় হয়ে থাকতো। তার তন্ময়তা দেখে মন্দা একদিন প্রশ্ন করেছিলো, ওগো, কখনো তুমি শেক্সপীয়র পড়েছো?

কেন বলো তো! তোমার আমার মাঝে আবার ও-বালাই কেন?

বালাই নয় গো! তার কোনো-কোনো বাণীটা কাজের। এই ধরোনা কেন এই বাক্যটার কতো মানে যা তোমার মনে রাখা উচিত—বিউটি প্রোভোকেথ্ থীভস্ স্থুনার ছ্যান গোল্ড। স্বামীর গলাটি সে দুহাতে জড়িয়ে বললে, আমাকে তোমার বুঝি সুন্দরী বলে মনে হয় না? বলো না গো?

তা ঠিক বলতে পারিনে। কিন্তু ও-কথা ওঠে কেন?

উঠবে না? তুমি কলকব্জা ভাববে, আমার যখন শুভক্ষণ তখন মদালস হয়ে থাকবে, আমাকে কে রক্ষা করে বলো?

প্রমোদ হো হো করে হেসে ওঠে। ভালো শেক্সপীয়র তুমি পড়েছিলে মন্দা। তোমার ঘরে-তৈরি শেক্সপীয়র নয়তো?

না গো একেবারে খাঁটি বস্তু। আচ্ছা, আমার ভয় করে না?

করে নাকি?

কলকব্জা ভাবো, আমার হাত নেই। তোমার পুরুষকারের চিন্তাকে আমি ঠেকিয়ে রাখতে পারবো না, কিন্তু অন্যটা? শুনবে একটা কথা?

বলো ডিয়র।

একটু প্রমত্ত উত্তেজিত হবার তোমার অধিকার আছে, আমারও আছে, নেই? কিন্তু সম্বিৎ হারাও সেই ভয়টা করে যে! তার লক্ষণও দেখি আজকাল মাঝে মাঝে। তাহলে বড়ো নিরাশ হবে কিন্তু!

অল্ রাইট মন্দা, মনে থাকবে।

প্রমোদকে বিধাতা নানা যন্ত্র বাজাবার অসাধারণ হাত দিয়েছিলেন। তারা দুজনে সময়ে সময়ে মগ্ন হয়ে সঙ্গীত সাধনা করতো। সে সাধনার দিন ক্ষণ ছিলো না। অস্পষ্ট ঊষা বা জ্যোৎস্নামগন অথবা তারাখচিত নিশা যেটা যখন প্রেরণা দিতো। তাদের বাংলাটা শহরের প্রান্তে না হলে বোধ করি তাদের সঙ্গীত সৃষ্টি সাধারণ জীবন-প্রবাহে আলোড়ন জাগিয়ে তুলতো। একদা সন্ধ্যায় বারান্দায় বসে মন্দা কিছু করতে করতে বোধ করি ছায়ানটে শ্রমগীত গাইছিলো মৃদুস্বরে। প্রমোদ টেনিস র‍্যাকেটটা ওদিকে রেখে নিঃশব্দ চরণে এসে মন্দাকে পিছন দিক থেকে জড়িয়ে ধরে বললে, এ পীস্ অব নিউজ ফর য়ূ, ডার্লিং।

বলো, আমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ করবো। প্রমোদ ইংরাজি বলতো খুব এবং ইংরাজিতে আলাপ করবার চেষ্টা করলেই মন্দা কেতাবী বাংলা ভাষায় তার উত্তর দিতো।

দাঁড়াও, আগে তোমার সেবা করি। প্রমোদ ঘরের ভেতর থেকে একটা জামিয়ার এনে মন্দার দেহটি সযত্নে আবৃত করে দিয়ে সামনে বসলো। শোন মন্দা; হদিস পেয়েছি এবার। ফ্যাক্টরি করবার মতো পুঁজি নেই তো আমার। আজ কাছারিতে আর ক্লাবে কলকাতার স্টক এক্সচেঞ্জের

এক মহাবীরের সঙ্গে আলাপ আলোচনা হয়েছে, আমি ওই কাজে যাবো, তুমি কি বলো ?

অবলা নারী, আমি কি বলবো বলো ! বিজয়ের মালা তোমাকে দিতে পারি, কিন্তু বিজয়ের পথ তোমাকে দেখাতে পারিনে তো ! তুমি যা ভালো বুঝবে আমার সায় আছে তাতে।

প্রমোদের মনে এ নতুন চিন্তা ক্রমশ বড়ো হয়ে উদ্দীপনা সংগ্রহ করলে। মন্দা দীর্ঘ পাঁচ বৎসর এলাহাবাদে কাটাবার পর বসবাস তুলে স্বামীর সঙ্গে কলকাতা গেলো। প্রমোদ নতুন রসে মেতে উঠলো। সঙ্গীত গেলো, টেনিস গেলো, অন্যান্য সব কিছু অভ্যাস গেলো। মন্দার দেহে মনে তার স্বকীয় মাধুর্য জড়ো হতে থাকলো। প্রমোদের ট্র্যাপডোর-হীন দালালি ব্রাউনবেরী ক্লাইভ রো আর ক্লাইভ স্ট্রিটে পরিক্রমা করে বেড়াতে লাগলো।

বছর খানেক পরে মন্দা একদিন তাকে জিগগেস করলে, কেমন বুঝছো বলো না কিছু ?

জোয়ার-ভাঁটার মাঝে জল কোথায় সমতল এখনো বুঝছিনে মন্দা, তোমাকে কি বোঝাবো !

মন্দা চুপ করে থাকে অবসরপ্রশস্ত গৃহস্থালীর কোণে। ছবি আঁকে, হ্যাংলার মতো যা পায় তাই পড়ে ; গান কিন্তু আর রসসিক্ত পথ দিয়ে আসে না। এমনি করে আরো একটা বছর ঘুরে যায়। এবার প্রমোদ নিজেই আসে, বলে, ডুবেছি মন্দা ; স্পেকুলেশ্যন অতলান্ত সাগর। বিষণ্ণ স্বামীকে মুখে সাহস দেয়, একটা উর্দু বাক্য মনে পড়ে যায় তার—

লড়িয়েরাই পড়ে রণক্ষেত্রে, অন্যে পড়ে না। কিন্তু তার বুক শুকিয়ে ওঠে, পায়ের তলা থেকে ধরিত্রীর পরম নির্ভরযোগ্য কঠিন সহায়টুকু সরে যাবার ভয়ে, যার বাড়া ভয় মানুষের আর নেই। তার গর্ভে সন্তান। ভয়টা আগামী বংশকে মনে করে বিষম হয়ে ওঠে। স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে হিসেব-কিতেবের অগাধ জঙ্গল সাফ করতে লেগে যায়। সকল দায়মুক্ত হয়ে দেখে পুঁজি তলানিতে, মাত্র হাজার দশেকে এসে দাঁড়িয়েছে, জীবনের প্রয়োজনে যা অকিঞ্চিৎকর।

সমূহ ক্ষতিটাকে মানুষ চেপে যায়, কানাকানি করে না তা নিয়ে। মন্দা স্বামীকে বলে, আর কলকাতায় নয়, বণিকনগরী তার জাঁতায় পিষে ফেলে দেবে। কাছারী ছাড়া উপায় রইলো না, বলো কোথা যাওয়া যায়? যাকে ত্যাগ করেছি, যেখানে প্রতিপত্তি ছিলো সে এলাহাবাদ আর নয়। এমন জায়গায় চলো যেখানে ব্যারিস্টর নেই, কিন্তু ব্যারিস্টরের কদর আছে।

খুঁজে-পেতে তারা হরদোই যাওয়া ঠিক করলে। স্থানটি ছোট, তার দাবী কম।

পরচিত্ত সহজেই অন্ধকার। বিফল প্রয়াসের আঁধার প্রমোদের চিত্তকে ছেয়ে ছিলো, মন্দা সে-অন্ধকার ভেদ করতে পারতো না। প্রমোদ মন্দার চেয়ে বারো বছরের বড়ো, আগে তাদের এ-পার্থক্য বোঝা যেতো না। পাঁজির বয়স আর দেহগত বয়স এক নয়। মন্দা এবার বুঝতে পারলে প্রমোদের বয়স বেড়েছে, আগেকার ছাপ আর কিছুই নেই।

সে কিন্তু স্বামীর পানাসক্তি বাড়তে দেখে অত্যন্ত দুঃখিত হোলো কিন্তু বাধা দেবার চেষ্টা করলে না।

তার বাইশ বৎসর বয়সে রঞ্জু জন্মালো।

অশোকের সঙ্গে যখন মন্দাদের পরিচয় হোলো তখন প্রমোদ অনেক সামলে উঠেছে, আবার ওদের সংসারে গান দেখা দিয়েছে।



ছয়

য়ূ আর এ রটার, মন্দা। আনাড়িকে শেখাবার আমার ধৈর্য নেই—সরো।

মন্দা টেনিস-কোর্টের ওপার থেকে খিলখিল করে হেসে উঠে বললে, বোঝ তাহলে স্বামীকে দিয়ে সব কাজ হয় না। স্ত্রীর সকল ব্যাপারে স্বামী অপরিহার্য নয়। ও অশোকবাবু, আসুন না! তুমি সরো না গো!

প্রমোদ একটু উষ্ণস্বরে বললে, ডোণ্ট স্পয়েল মাই গেম, ডার্লিং। অশোক এসো।

অশোক চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ভাবলে, ডার্লিং কথাটার সঙ্গে কণ্ঠস্বরের যেন কোনো সামঞ্জস্য নেই, অমন কথাটার অপ্রব্যয় হোলো।

একটু দূরে একটা গুদাম-ঘর ছিলো, মন্দা সেই ঘরের মসৃণ রন্ধ্রশূন্য দেওয়ালকে প্রতিদ্বন্দ্বী করে বল পিটতে লাগলো। অশোক তাকে বলেছিলো, দেওয়ালের মতো বিচক্ষণ টেনিস-শিক্ষক আর নেই। এদিকে খেলা আরম্ভ হোলো। অশোক প্রমোদকে বিপর্যস্ত করে তুললে। যেন মন্দাকে কোর্ট থেকে তাড়িয়ে দেবার অপরাধের প্রতিশোধ নিচ্চে। বিশ মিনিটে প্রমোদ দু'সেট হারলো, কষ্টে-স্বষ্টে দুটো সেটে মাত্র দুটি গেম নিয়ে। প্রমোদ কুশলী হোলেও আটত্রিশ আর চব্বিশে অনেক

তফাৎ, তার ওপর চব্বিশের পক্ষে অধিকতর কৌশল দম আর ক্ষিপ্রতার যোগ ছিলো। প্রমোদ ঘর্মাক্ত কলেবর হয়ে দম নিতে নিতে বললে, নাউ য়ূ ক্যান হ্যাভ ইওর পিউপিল্, অশোক!

অশোক হাঁক দিলে, ও বৌদি, আসুন না!

মন্দা আঁচলটা দৃঢ় করে কোমরে জড়াতে জড়াতে বললে, বেশি খাটাবেন না যেন, বুঝলেন?

অশোক মন্দার হাতের কাছে বল দেয়। ক্রমশ বলের আদান-প্রদানের গতি বাড়ায়, মন্দার হাতের কাছ থেকে দূরে বল ফেলে, এদিক ওদিক দৌড় করায় তাকে। সময়ে সময়ে চেঁচিয়ে ওঠে, ওকি হচ্চে, ও বৌদি! অমন করে সরে গিয়ে ডান দিকে বলটি গুছিয়ে নিতে হবে না। এই নিন আবার। বেশ হয়েছে ব্যাক হ্যাণ্ড! আবার অমনি করে—আবার—আবার। মজা হোলো তো? ও বৌদি, এবার একটু মজা করা যাক, কি বলেন? অশোক একটা বল লব্ করলে, সেটা আকাশ সমান উঁচু হয়ে মন্দার পিছন পানে গেলো। বলটা ধরবার জন্য তার ওপর লক্ষ্য রেখে তাড়াতাড়ি পিছু হাঁটতে গিয়ে মন্দা দুপ করে পড়ে গিয়ে হেসে উঠলো। তারপর ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়িয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে বললে, যান, এ আপনার ইচ্ছে করে আমাকে জব্দ করা, আমার তো আর শোধ নেবার উপায় নেই! আচ্ছা মনে রইলো, একদিন সুদে-আসলে পুষিয়ে নেবো কিন্তু। খেলা থামলো না। অশোকের ক্লান্তি বলে কোনো কিছুর সঙ্গে পরিচয় নেই, মন্দাও প্রাণশক্তিতে ভরপুর। সেও খেলায় সত্যই মন দেয়, এক-একবার নিজেরই ওপর বিরক্ত হয়ে মুখ ভার করে বলে, পোড়া-

কপালে বলটাকে নিয়ে পারবার যো নেই, নেট আঁকড়েই থাকবেন উনি! পাঠাচ্ছি এবার একেবারে যমালয়ে! বলটা দৃষ্টিপথের বাইরে উড়ে যায় বাজপাখির মতো। অশোক মন্দার উষ্মা দেখে হেসে ওঠে। সে বললে, ও বৌদি, কোর্টের এ-ধারটাও যে চক্ষুওয়ালা গ্রামে, মুসৌরি ল্যাণ্ডোরে নয়।

প্রমোদ আসন থেকে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, য়ূ আর ইমপসিবল্, মন্দা। আচ্ছা, আমি চললুম কাপড় বদলাতে অ্যাণ্ড ফর মাই ওয়ক।

সে চোখের আড়াল হতেই মন্দা বল ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে এসে বললে, ও অশোকবাবু, স্ত্রীর হয়ে স্বামীকে অমন করে জব্দ করতে নেই। স্ত্রীর সেটা ভালো লাগলেও লাগতে পারে কিন্তু তাতে লোকনিন্দার ভয় আছে, আর স্বামীও উদ্দেশ্যটা ধরে ফেললে চটে যেতে পারে। স্বামী বড়ো মনপাতলা কঠিন জীব মশাই! দাঁড়ান, মিনিকে রক্ষা করবার লোক খুঁজছি। চতুর্দিক থেকে মন্দার হাসির প্রতিধ্বনি ফিরে এলো। অশোকের কানে ঘাড়ে রক্তস্রোত ছুটে গেলো। কথা বেড়ে যাবার ভয়ে সে আর মন্দার দিকে ফিরে চাইলে না, হাত বাড়িয়ে বলের জন্য পিকারের দিকে ফিরে দাঁড়ালো, ছেলেটাকে বললে, গোলি লাও জলদি। মন্দার পিকারও অন্য বলটা অশোকের দিকে ছুঁড়ে দিলে।

অশোক সার্ভিস করতে যাচ্ছিলো ; ওপার থেকে মন্দা বলে উঠলো, ওমা, শেষে কি আপনার মাথা খারাপ হয়েছে বলে কাঁদতে বসবো নাকি ? আমার সার্ভিস যে শেষ হয়নি। অশোক লজ্জিত হয়ে একসঙ্গে বল দুটোতে র‍্যাকেটের আঘাত করে মন্দার দিকে পাঠিয়ে দিলে। মন্দা

আর কিছু না বলে প্রথম বলটা সার্ভ করলে, সেটা নেটে আটকালো। দ্বিতীয় বলটা ওপর দিকে ওছলাতে গিয়ে বললে, আপনাকে কিছু বলে কয়ে লাভ নেই, একেবারে কাঠের পুতুলটি। অন্যমনস্কতায় সে লক্ষ্য করলে না যে ওছলানো বলটা নিচে নেমে পড়েছে, বাঁ হাতটা নামেনি। তার র‍্যাকেটের জোরালো আঘাত বলে না লেগে হাতেই লাগলো। নিমেষে মন্দার মাথা পর্যন্ত ঝিমঝিমিয়ে উঠলো, তার চতুর্দিকে ঘেরা আঁধারের মাঝে শতসহস্র দ্রুত ঘূর্ণায়মান হলুদবরণ ছাপ ফুটে উঠলো, শাদা ভাষায় যাকে বলে সরষে ফুল। র‍্যাকেটটা আঘাতের প্রথম মুহূর্তেই তার হাত থেকে খসে পড়েছিলো। মন্দা চোখ বন্ধ করে বাঁ হাতটা চেপে ধরে টলছিলো। অশোক এক লম্ফে নেটটা পার হয়ে ঈষৎ একটু ইতস্তত করে মন্দার হাতটা নিজের মুঠিতে নিয়ে একটা পিকারকে বললে, একঠো কুর্সি অওর ঠণ্ডা পানি লাও জলদি। বসুন বৌদি। মন্দা ধপ করে বসে পড়লো ডান হাতে কপাল চেপে। অশোকের হাতে মন্দার আঘাতপ্রাপ্ত আঙুলগুলো কালশিরায় নীল হয়ে গিয়েছে ততক্ষণে। একটু দূরে ইঁদারায় তখনো চরসা চলছিলো, পিকার ছেলে দুটো এক ডোল হিমশীতল জল এনে মন্দার হাতের ওপর আস্তে আস্তে ঢালতে লাগলো। ঠাণ্ডা জল বা বরফের মতো খেলার আকস্মিক আঘাতের আর ওষুধ নেই। মন্দা এতক্ষণ চোখ বুজিয়ে ছিলো, অনেকটা সুস্থ বোধ করে ধীরে ধীরে চোখ খুললে; চোখে রক্তকণিকা ভরা, বেদনাকে ব্যাহত করবার জন্য দেহাভ্যন্তরের হঠাৎ আলোড়নের নিবিড় পরিচয়। ব্যথা কমে এসেছিলো, অশোকের দিকে মুখ তুলে চাইতেই

মন্দা হেসে ফেললে, বললে, আমার লঘুপাপে গুরুদণ্ড হোলো। দোষ আপনার কিন্তু। ১৪ আউন্স র‍্যাকেট নিয়ে গোঁয়ারে খেলে, কোনো মহিলা খেলে না। আজ পর্যন্ত আমার র‍্যাকেট জুটলো না একটা।

আপনার খেলা শিখে কাজ নেই, সাত জন্মেও হবে না, একেবারে রাম-আনাড়ি। অন্যের গায়ে কাঁটা ফোটাতে গেলে হাতে হাতে শাস্তি আছেই। ভগবান নেই মনে করেন নাকি ?

একটা ছেলে আর এক ডোল জল এনে তখনো মন্দার হাতে ঢালছে। মন্দা মুখ তুলে মৃদুস্বরে বললে, ফুটেছে নাকি কাঁটা ? কোথা ফুটলো ?

ছোট্ট ছেলেটা কাঁটা কথাটা শুনে উলটো বুঝলে। খপ করে মন্দার বেদনাময় করপল্লবটি হাতে নিয়ে নিরীক্ষণ করে জিগগেস করলে, কাঁটা কহাঁ লগা মেমসাব ? মন্দা হাসতে হাসতেই উঃ বলে উঠলো, অশোকও হাসলো। মন্দা মুখ টিপে বললে, ও অশোকবাবু, কাঁটা ফোটার মাধুর্য কেমন ছোঁয়াচে দেখেছেন ?

ঢের হয়েছে, এখন বাড়ি চলুন। অশোক নিজের রুমাল ভিজিয়ে মন্দার হাতে জড়িয়ে দিলে।

যেতে যেতে মন্দা বললে, আচ্ছা, বেদনার পথ ভিন্ন কাছে পাওয়া যায় না, না ? আজ কিন্তু পেলুম।

অশোক একটু থেমে তার দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে জিগগেস করলে, মানে ? ও আবার কি হেঁয়ালি হোলো ?

মন্দা রুমাল-জড়ানো হাতটা মুখে চাপা দিয়ে হাসলো, উত্তর দিলে, সবটাই কি আপনার শরীর, মন বলে কিছু নেই ? মানে আবার কি ?

জানেন না আমি পূজো করি, আরাধনা করি। সরষে ফুল দেখতে গিয়ে আরাধ্যকে দেখলুম আর কি!

হেঁয়ালি তবুও পরিষ্কার হোলো না, তারা আবার চলতে লাগলো। মন্দা পথের একটা স্থানে এসে মাথা নেড়ে বললে, ও অশোকবাবু, সোজা পথে গেলে তাড়াতাড়ি ফিরতে হয়, কি বলবো, নীড়ে না খাঁচায়! ঘুরে চলুন। যেতে যেতে বললে, আজ যদি আপনাকে গান শোনাতুম কি গাইতুম জানেন?—'কণ্টকে গড়িল বিধি মৃণাল অধমে।'

মৃণালের গঠনে কাঁটা ছিলো কি না মৃণালের নির্মাতা বঙ্কিমচন্দ্র জানতেন, অশোকের মনে হোলো তার দেহ যেন রোমাঞ্চের কাঁটা দিয়ে গড়া।

অতো রাত্রে বেয়ারার সঙ্গে মন্দাকে আসতে দেখে মিনি আর অশোক তাকে সম্বর্ধনা করতে বাইরে ছুটে গেলো। মিনি প্রথমেই জিগগেস করলে, হাতে কি হোলো মন্দাদি?

অশোকের দিকে অপাঙ্গে চেয়ে মন্দা উত্তর দিলে, জানিসনে? একলব্য তার গুরুকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি দিয়েছিলো, আমি পুরো হাতটাই দিয়েছি। কি বলেন অশোকবাবু?

মিনি অশোককে বললে, হ্যাঁগো, তুমি তো কিছু বলোনি! কি করে লাগলো?

মন্দা দুষ্টু হাসি হেসে বললে, বলবেন আর কি করে, ঘা দিয়েছেন তো উনি নিজে! মন্দার চোখ কৌতুকে মাধুর্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সে

যাকগে, আপনি কোথাও পালান, আমরা সখীতে সখীতে কানাকানি করবো। বেয়ারাটাকে বিদেয় করে দিন। আপনি পৌঁছে দেবেন, কেমন?

অশোক বললে, তাহলে আমি চললুম প্রমোদদা'র কাছে।

লাভ হবে না গো ঠাকুর। রসের জগতে 'দাউ অ্যাণ্ড এ ফ্লাস্ক অব ওয়াইন' অপূর্ব মিলন। কিন্তু 'দাউ' এখানে। শুধু ফ্লাস্ক অব ওয়াইন ঘুমের মাধুর্যটুকু কেড়ে নিয়ে ঘুম পাড়ায়। সে ঘুম মৃত্যুর মতো।

অশোকের নিজের কাছে 'দাউ অ্যাণ্ড দি উইস্টারিয়া বাওয়ারের' অসহ্য মাধুর্য ছিলো। মন্দার সংস্করণে বিচ্ছেদের নিরাশা তার কানে বাজলো।

যান না, দাঁড়িয়ে আছেন কেন? কোথাও গিয়ে মিনিকে ভাবুনগে, ওর নানা প্রকাশ কল্পনা করুন গিয়ে। করেছেন কখনো? মধু ক্ষরে তাতে। নতুন বিদ্যা দিলুম আপনাকে, এইবার যান।

খাটের ধারে পা ঝুলিয়ে বসে মিনিকে উরু দিয়ে বেঁধে নিবিড় আলিঙ্গন করে মন্দা বললে, রাক্কুসি মিনি, শিগগির আমাকে চুমো দে। মিনি অবাক হোলো; লজ্জায় রক্তিম হয়ে মন্দার কাঁধে মুখ গুঁজে হাসতে লাগলো। মন্দা তার মুখ তুলে ধরে বললে, দিবিনে? সে নিজেই মিনির ওষ্ঠে অসংখ্য চুমো দিলে। লক্ষ্য করলে মিনি দেখতে পেতো মন্দার চোখে উন্মত্ত বিজলী, প্রাবৃটের কাজলকালো আকাশেও বুঝি সে বিজলী দেখা যায় না। মিনিও মন্দার পীড়নে তাকে চুমো খেলে সসঙ্কোচে। মন্দা তার গাল টিপে ধরে বললে, ও-রকম করে নয় পোড়ারমুখি; যেমন করে অশোককে দিস তেমনি করে!

মৃদু স্বরে মিনির কানে এলো, ওরিয়েন্টল চুমো জানিস মিনি? জানিস নে? পরক্ষণে মন্দার জিহ্বাগ্র মিনির তালু পিষ্ট করলে। মিনির লজ্জা সঙ্কোচ উড়ে গিয়েছিলো এই প্রগল্ভার আয়ত্তে থেকে; তার সর্বাঙ্গ উষ্ণ হয়ে উঠলো, স্নায়ুপ্রকরণে জাগলো বিচিত্র অনুভূতি। মন্দা তখন মিনিকে ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, বললে, কেন এসেছিলুম জানিস? তোকে এমনি করে আদর করতে ইচ্ছা হোলো আজ। বিজলীর স্ফুলিঙ্গ দিয়ে গেলুম তোকে, বুঝলি?

দেহের প্রতিক্রিয়া ছাড়া মিনি বুঝলো না কিছুই।

ও অশোকবাবু, পৌঁছে দেবেন নাকি? না থাক, একাই যাই।

অশোক বাহিরের বারান্দার আরাম-কেদারা থেকে উঠে দাঁড়ালো, বললে, তাও কি হয় এতো রাত্রে। চলুন যাচ্ছি। একটা মোটা লাঠি ও উজ্জ্বল আলোটা তুলে নিয়ে সে অগ্রসর হোলো।

নিজের ফটকের কাছাকাছি এসে মন্দা হঠাৎ বললে, আচ্ছা অশোক, তোমাকে যদি আমার নাম ধরে ডাকবার অধিকার দি? না না, কাজ নেই। 'আপনি' আর 'বৌদি' বলতে বেশ লাগে, না? তাই থাক। দিন হাতটা ভালো করে বেঁধে।

আকাশে আলোর অবতরণিকা, তখনো শুকতারা জ্বলজ্বল করছে। আলোর দাক্ষিণ্য আকাশকে বিস্তীর্ণ করেনি। মন্দা প্রভাতে মন্দভাগী রজনীগন্ধার কেয়ারির মাঝে দাঁড়িয়ে জানলার দিকে মুখ রেখে মৃদুকণ্ঠে ডাকলে, মিনি, ও মিনি, উঠেছিস না কি? জানলাটা মিনির দিকে।

সে তৎক্ষণাৎ উঠে নীলাম্বরীর স্খলিত আঁচলটা টানতে টানতে খাট থেকে নেমে গিয়ে জানলার চিক তুলে বললে, আপনি মন্দাদি, এতো সকালে? আসছি আমি।

অশোক ওঠে নি?

না, ডাকবো না কি?

দূর। তাকে আমার কি দরকার? মন্দা কথা কইতে কইতে মিনির চোখের দিকে চেয়ে রইলো। সে জানতো পুরুষের চোখ শুধু দর্শনেন্দ্রিয়, বাহিরকে দেখাই তার কাজ। নারীর চোখে তার অন্তরের ছায়া, চির-প্রহেলিকার দ্যুতি। মেয়েদের চোখই শুধু দেখবার মতো তা মেয়েরা জানে, তাই না তারা কাজল দিয়ে সুর্মা টেনে শুধু চোখের শোভা বাড়ায় না, অন্তরের মাধুর্য প্রকাশ করে প্রহেলিকার অসহ্য মায়া আকর্ষণে নিজের ভুবনটি ছেয়ে ফেলে।

মিনি জিগগেস করলে, এতো ভোরে উঠে এলেন যে আজ?

শিবরাত্রি গেছে যে কাল, পোড়ারমুখি! তোর সে জ্ঞান আছে?

ওমা শিবরাত্রি! আমি জানিনে তো! দাঁড়ান মাকে বকে আসি।

মিনি উঠে দাঁড়ালো। মন্দা তার আঁচল টেনে বসিয়ে বললে, এ কি পাঁজিতে লেখা শিবরাত্রি যে মাকে জিগগেস করবি? আমার শিবরাত্রি। তার ধরাবাঁধা দিনক্ষণ আছে নাকি? মন্দা তার সহজ উচ্চস্বরে হেসে উঠলো।

অশোকের ঘুম ভেঙেছিলো মন্দার কণ্ঠস্বরে। তার কানে গিয়েছিলো শিবরাত্রি কথাটা। জামার বোতাম দিতে দিতে সে দরজার ওপর

দাঁড়িয়ে বললে, সুপ্রভাত বৌদি, কিন্তু আপনি আবার শিবরাত্রি করলেন কবে? কাল তো আমাদের সঙ্গে চা খেলেন। রাত্রের খাওয়াটাও নিশ্চয়ই বাদ পড়েনি। দেবতা ঠকাবেন না তা বলে! অশোক হেসে উঠলো।

খাবোনা কেন? উপবাস করা তো মনঃশক্তিকে তীক্ষ্ণ করবার জন্য, মনকে পূজায় কেন্দ্রগত করবার উদ্দেশ্যে। আমার ও-সাধারণ সংযম আচারের দরকার আছে নাকি? আমার মন কেন্দ্রগত হয়েই আছে গো ঠাকুর!

মিনির ততক্ষণে জ্ঞানচক্ষু খুলেছিলো, সে অশোকের দিকে চেয়ে বললে, মন্দাদির কথা শুনো না গো। আষাঢ় মাসে আবার শিবরাত্রি!

অশোক উত্তর দিলে, তা হয় গো হয়। আষাঢ়ে গল্প হতে পারে আর আষাঢ়ে শিবরাত্রি হতে পারে না? কি বলেন বৌদি?

আমাকে তোরা ঠাট্টা করে খর্ব করছিস মিনি। এ শিবরাত্রি সত্য, আমার মানস করা।

মিনি উঠলো, বললে, আপনারা গল্প করুন মন্দাদি, আমি স্নান করে আসি। পালাবেন না দিদি, চা খেয়ে যাবেন।

মন্দা হঠাৎ কি ভেবে বললে, এক কাজ কর না মিনি, চল আজ নদীতে নেয়ে আসি। আমার শিবরাত্রির সঙ্গে তার সামঞ্জস্য থাকবে, কি বলেন অশোকবাবু? আমার জন্যেও কাপড় আনিস, কেমন?

অশোক মিনিকে কি বলতে যাচ্ছিল, মন্দা বাধা দিয়ে বললে, না না, আপনাকে নাইতে হবে না। শেষে ভোর বেলা নেয়ে অসুখ করবে।

স্নিগ্ধ সোনালি আলোয় ধরিত্রী ছাওয়া। পথ চলতে চলতে মন্দার মনে

হোলো, এমন মধুর প্রভাত সে জীবনে দেখেনি। পুরাতন এই পৃথিবীর চিরনবীনতা এমন করে তার মনে সাড়া দেয়নি কোনোদিন। মন্দার কণ্ঠে একটা গান গুনগুনিয়ে উঠলো। আগে সেটা ছিলো যেন শুধু বাক্যের সমষ্টি। গানটা উদ্বেল হয়ে উঠলো তার মনে আনন্দ উপলব্ধির অসহ্য শক্তিতে। সে বলে উঠলো, মিনি গান শুনবি? ও অশোকবাবু গান শুনবেন? তাদের সম্মতির অপেক্ষা না করে পথের ধারের একটা শিলার ওপর বসে পড়ে মন্দা মৃদুস্বরে গেয়ে উঠলো—'আলোকের এই ঝরনা ধারায় ধুইয়ে দাও।'

গানটা সমাপ্ত হবার অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত অশোকের হৃদস্পন্দনে যেন বাজতে লাগলো—

'যেজন আমায় জড়িয়ে আছে ঘুমের জালে
আজ এই সকালে ধীরে ধীরে তার কপালে
অরুণ আলোর সোনার কাঠি বুলিয়ে দাও।'

দুরে মুসৌরী পাহাড়গুলোর শিখরে বিশ্বরহস্যের বিশ্বের প্রাণের সোনার কাঠি প্রাণরসিক কে যেন বুলিয়ে দিয়েছে।

ও অশোকবাবু, বলুন না! নৈবেদ্য যথাস্থানে পৌছয়?

মানে? অশোক সচকিত স্বরে পাল্টা প্রশ্ন করলে।

আঃ মিনি। তুই এ-বোকা সামলাস কি করে? মানে নেই। বলুন না পৌছয় কি না?

যথাস্থানের মেজাজ আমি কি করে জানবো বৌদি। বৈতরণীর ওপারের খবর জানবার আমার এখনো সময় আসেনি যে!

আচ্ছা জ্যাঠামশায়। আমি ও-পারের কথা বলিনি। যথাস্থানটি যদি এ-পারে হয়? আপনার বলে কাজ নেই থাক। আমি জানি পৌছয়—পৌচেছে। কি বলিস মিনি?

চাইনিজ পাজল্ দেখেছেন বৌদি? এই আপনি।

আপনি পাড়ে নামছেন যে? না না, ও অশোকবাবু, আপনি এইখানে থাকুন গাছের আড়ালে। নদীর কিনারায় যেতে হবে না। এইখানে বসে বসে বারবেল ফুটবল টেনিস ভাবুন মনে মনে। অশোক দাঁড়িয়ে গেলো। মন্দা বললে, আয় মিনি। পাড দিয়ে নামতে নামতে অশোকের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে অপাঙ্গে চেয়ে আবার বললে, কোনো মানুষের কল্পনা করবেন না যেন এখন, বুঝলেন? অশোক লজ্জায় অভিভূত হোলো মন্দার কথায়। প্রথমে তার নিষেধের কোনো অর্থ মনে হয়নি, ইঙ্গিত অর্থটাকে পরিস্ফুট করে দিলে। অশোক জোর করে তার অন্তর্দৃষ্টিকে চৈতন্য কল্পনার রঙ্গমঞ্চ থেকে ফিরিয়ে নিলে। একটা আমগাছের মোটা ডাল ধরে সেটাকে ভাঙবার জন্য নিজের দেহের সমস্ত শক্তিটুকু নিয়োগ করলে।

স্বল্পতোয়া নদীটিতে গলা-ডোবানো জল খুঁজে নিয়ে মন্দা-মিনি দেহ নিমজ্জিত করলে! অন্তর্গূঢ় নদীর কলধ্বনিতে অন্তর্গূঢ় যুবতীদুটির কাকলী মিশে গেলো। যুবতীর লীলাসঙ্গ লীলাবিহারে নদী বুঝি সার্থক!

অনেক কাল পরে মন্দা উচ্চস্বরে ডাক দিলে, ও অশোকবাবু নেমে আসুন। ওমা জামা ছিঁড়লেন, দুটি হাত ছড়লেন কি করে?

ওই আম গাছটার সঙ্গে বল পরীক্ষা করছিলাম বৌদি! হার মানতে হয়েছে।

ছেলে না দস্যি! মন্দা প্রীতির চোখে চেয়ে হাসলো।

সভ্যস্নাতা আলুলায়িত কুন্তলার রূপ বিশিষ্টক্ষণের অপরূপতায় মধুর, ক্ষণিকতাও তার তেমনি। অশোক মন্দা-মিনিকে মুগ্ধ হয়ে দেখছিলো। মন্দার সঙ্গে চক্ষু মিলতেই সে চোখ নামালে।

মিনি, আজ যে আমাকে গানে পেয়েছে রে। কি করবো?

গান না ভাই। কি ভালো যে লাগে! মিনি আগ্রহান্বিত হয়ে উঠলো।

প্রভাতের মধুর গান পরিপূর্ণ তৃপ্তি নিয়ে তাদের অন্তরে আত্মায় বিলীন হয়ে গিয়েছিলো। এবারও ফিরতি পথে অশোক মন্দার গানের টুকরো-টুকরো করে শ্রুতিতে আটকে যাওয়া সুর সম্বলিত কথাগুলো জপমালার মতো মন দিয়ে ঘোরাতে লাগলো—

'এতো দিন তো ছিলো না মোর কোন ব্যথা
সর্ব অঙ্গে মাখা ছিলো মলিনতা—'

বাড়ির কাছাকাছি এসে মন্দা বললে, হ্যাঁরে মিনি, শিবরাত্রি সার্থক হোলো না? নৈবেদ্য পাঠালুম, জাগলুম, ধ্যানে দিলুম প্রেম, গান দিয়ে সম্পূর্ণ করলুম হৃদয় নেঙড়ানো প্রার্থনা।

অশোক পিছিয়ে ছিলো, মন্দার শেষ কথাগুলো শুনতে পেলে না।



আরাম কেদারায় শুয়ে ফরসির নল মুখে দিয়ে প্রমোদ মশগুল হয়েছিলো, ভিতর দিক থেকে মন্দা এসে একটা মোড়া টেনে নিয়ে তার মুখের সামনে বসে জিগগেস করলে, হ্যাঁগো, কখনো 'ফিজিওলজি অব ম্যারেজ' পড়েছো, না ফাঁকি দিয়ে আমাকে বিয়ে করেই খালাস? পড়নি? মন্দার কানের দুল কৌতুকে দুলে উঠলো। প্রশ্নটা করে প্রখর দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসলো, বলোনা গো!

প্রমোদ নির্বিকারভাবে পা নাচাচ্ছিলো, নলের মুখে দীর্ঘ টান দিয়ে সুবাসিত ধোঁয়ার একটা বিরাট পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে উত্তর দিলে, কাট্ দ্যাট্ আউট, মন্দা। শুধু শুধু পড়তে গেলুম কেন? হ্যাভ আই নট ম্যারেড? দুর্বোধ্য সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়নি সে সময়ে? দ্যাট ওঅজ এনাফ আই থিঙ্ক। তার আবার ফিজিওলজি। রাবিশ। কেন ওসব পড়ে মাথা খারাপ করতে যাও? আজ আর তোমার রান্না খাওয়া যাবে না।

যাবে গো মহাশয় যাবে। পড়নি তাহলে? পড়া উচিত কিন্তু। পড়লে চমৎকার জ্ঞানলাভ করতে যে, যে-স্বামী নাসিকা গর্জন করে শুধু নিদ্রাই দেয়, যে-স্বামী সোমরস পানে আপনাতে আপনি বিভোর হয়ে থাকে

তার বৌ পালায়, ঘরে থাকে না। মন্দা আবার মুখ চাপা দিয়ে হাসির তরঙ্গ ছুটিয়ে দিলে।

প্রমোদ আবার ধোঁয়া ছেড়ে নির্বিকার চিত্তে বললে, প্লীজ ইওরসেল্‌ফ ডিয়র। কিন্তু যাবার আগে ঠিকানাটা রেখে যেও বুঝলে? আমিও সেখানে যাবো।

নাঃ তোমার লজ্জা নেই। আমারো দেখছি পালানো হবে না। কিন্তু যাই বলো, বড়ো তাড়াতাড়ি অস্ত গেলে তুমি। এই যে আর একজন! ওমা, নিভৃত বিশ্রম্ভালাপের মাঝখানে চোরের মতো কোন দিক দিয়ে এলেন আপনি, ও অশোকবাবু? বুঝলে গো, এঁর অদৃষ্টেও ওই দুর্গতি আছে। খালি ফুটবল আর ফুটবল! মনটি ঘুমিয়ে পড়ে অবিশ্রান্ত নাসিকাগর্জন করছে।

ব্যাপারটা কি বৌদি? প্রমোদদাকে দেখছি তো আগেই কাত করেছেন!

শুনবেন নাকি? শোনা উচিত আপনারও। কি রকম লোকের বৌ পালায় তার ঋষি-বাক্যে নজির দিচ্ছিলুম। বেশ হয় মিনি যদি পালিয়ে যায়, হয়না? কি দুঃখে পালানো উচিত জানেন? শুনুন, তুমিও শোনো গো—

বুঝনু এ সখি কানু গোঙার।
পিতল কাটারি কামে নাহি আয়ল
উপরহি ঝকমক সার।

আঁখি দেখইত কুপ ধসি খসল

কাহে গহল দুই বাটে।

চন্দন ভরমে শীমর আলিঙ্গল

শেল রহল হিয় কাটে।

মন্দা পদ্যটা আবৃত্তি করলে অশোকের দিকে চেয়ে চেয়ে। অশোক তার নয়নভঙ্গিমা ও ওষ্ঠে দুষ্টামি দেখে কিছু না বুঝেই উচ্চৈস্বরে হেসে উঠলো। প্রমোদ জিগগেস করলে, অর্থ টা কি হোলো?

তবেই তো বিপদে ফেললে আমাকে, কি করে বলি? অবগুণ্ঠন কেড়ে নিতে নেই গো! যতক্ষণ অবগুণ্ঠন থাকে ততক্ষণই সুধার ইঙ্গিত। সব অবগুণ্ঠন সুধা ঢাকা দিয়ে রাখে না। সুধার বদলে হলাহলও বেরিয়ে পড়তে পারে।

না বৌদি, বলতেই হবে। না হলে মনে করবো দুটি অজ্ঞ মুখখুকে এই সকাল বেলায় আপনি চুটিয়ে গালাগালি দিয়ে নিলেন।

মন্দার গাল দুটি রক্তিম হয়ে গেলো। অশোকের দিকে একবার চেয়ে চক্ষু আনত করে বললে, শুনুন তাহলে। কিন্তু বৌদিটিকে প্রগল্‌ভা ভাববেন না যেন। কাব্যরস প্রগল্‌ভ, আমি কি করবো। অস্যার্থ—সখি, বুঝেছি, কানাই মুর্খ। পেতলের কাটারি কোনো কাজে এলো না, ওপরের চকমকে চাকচিক্যই সার। চোখে দেখেও কুয়োর ভেতর লাফিয়ে পড়লুম। একসঙ্গে দুটি পথ ধরলুম। নিজের কুলরক্ষা ও শ্যামের প্রেম এই উভয় পথ কেন অনুসরণ করতে গেলুম? চন্দন ভ্রমে শিমুলগাছ আলিঙ্গন করলুম, হৃদয়ে শেলতুল্য কাঁটা বিঁধে রইলো।

অর্থটা বলতে বলতে মন্দা অশোকের দিকে চাইলে। তার কণ্ঠস্বরে পূর্ববৎ কৌতুক নেই, আছে গাম্ভীর্যের আভাস। অশোকের মুখমণ্ডল থেকে হাসির রেখা-কুঞ্চন নিমিলিত হয়ে গেলো। হাসবার চেষ্টা করেও তার মুখে হাসি ফুটলো না, মনে জাগলো কিসের একটা অস্পষ্ট অনুভূতি।

প্রমোদ তামাক খাওয়া শেষ করে চোখ বুজিয়ে ছিলো। মন্দার কথা শেষ হতে সে বললে, থ্যাঙ্ক য়ূ, মন্দা। সুন্দর। কিন্তু কোন কবির ঘরে সিঁধ কাটলে ডার্লিং? বেরা—ঘুমনে কা জুতা। তোমাদের কাব্যের জ্বালায় বেরুলুম, অশোক। আজ বেড়ানো হয়নি, চললুম। তোমরা কাব্যে মাতো। সে মাথায় টুপি দিলে; বেয়ারার হাত থেকে বেঁটে মালাক্কা কেনটা নিয়ে চলে গেলো।

ও অশোকবাবু, চলুন রান্নাঘরে। শুধু কাব্যে পেট ভরবে না তো! খাবেন আজকে এখানে? খাননা। খালি মিনির পরিবেশন করা সুধাই খাবেন? রোষ্ট খেতে গেলেই আমার আপনাকে মনে পড়ে যায়, হজমের গোলমাল বাধে। মোড়াটা নিয়ে আসুন।—বসুন এইখানে। নেহাত স্বামীর নুন খাই, গৃহকর্মে অবহেলা করলে পাপ হবে। সে কি একটা বস্তুতে জাফরান ছড়িয়ে দিলে, সারা বাড়িটা গন্ধে আমোদিত হয়ে উঠলো।

মিনি এলো না কেন, কি করছে সে?

শাশুড়ী ঠাকরুনের কর্মস্রোতে ভেসে গিয়েছে, সকাল থেকে পাত্তা নেই।

ভারি ভুল কিন্তু। তাকে কর্মসখি না করে নর্মসহচরী করা উচিত ছিলো আপনার, ছিলো না? ও অশোকবাবু। অশোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিজেকে দেখিয়ে মন্দা বললে, আপনার এ মর্মসাথীটি যে চললো! সত্যি আমরা ফিরে যাচ্ছি।

তাই নাকি বৌদি, হঠাৎ যাওয়া কেন?

বড়ো গরম। উনি বলছেন হরদোই আর চক্ষুওয়ালা একই। তফাৎ যদি নেই তবে এখানে থাকা কেন। যাবো আমরা দিন আট দশের মধ্যে। মাঝের বৃষ্টির ঝোঁক কেটে গিয়ে সত্যই দিন কয়েক থেকে খুব গরম পড়েছিলো। প্রমোদ অস্থির হয়ে উঠেছিলো।

আমার ইচ্ছা ছিলো না এখানকার প্রীতি আনন্দকে ছেড়ে যেতে। কিন্তু কি করবো। গান্ধারীর, না না সীতার যুগ থেকে পতির মতে সতীর গতি, নয় কি? চলো দণ্ডকারণ্যে; বলতে হবে, বহুত খুব, চলো। যাও নির্বাসনে, তাও বলতে হবে, বেশ যাচ্ছি। মন্দা হাসলো। অশোক চুপ করে রইলো। মন্দার কথাটাকে কৌতুক বলে মনে করলে তখন।

একটা কথা কবুল করবেন, বলুন না করবেন কিনা?

কি, শুনি আগে।

মিনিকে ভালোবাসেন জানি। কিন্তু জানতে ইচ্ছা করে সে ভালোবাসার জোর কতো, গভীরতা কতো। স্ত্রী অভ্যাসের, প্রিয়া প্রকৃত ভালোবাসার। বলুন না।

অশোক হাসলে, উত্তর দিলে, জানিনে। ট্যগ অব ওয়ার করিনি কোনোদিন তা নিয়ে।

বলুন না, মিনি আপনার জ্ঞানের, না ধ্যানের ? ও অশোকবাবু। ধ্যান-চিত্তে যে আছে, ধ্যান দিয়ে যার দেহাতীত নিত্য নব-নব রূপ দেখা যায়, সীমা নেই নিঃশেষ নেই যার ধ্যানরূপের সেই তো প্রিয়া, সেই তো সত্যকার ভালোবাসা—অবিচল অবিনাশী অমর, নয় কি ? দিন না সায় ?

জানিনে বৌদি।

জানেন না ! কল্পনার কেন্দ্রে আপনার মিনি নেই ? বলবেন না ও-কথা ! ও অশোকবাবু, আজ থেকে গুরু হলুম আপনার ! আপনার ধ্যানলোকের দরজা খুলে দিলুম। এইবার মর্তে নেমে আসুন। চেখে দেখুন রোষ্ট কেমন হয়েছে। নেমন্তন্ন তো আর নিলেন না !

প্রমোদ সেই দিনই সন্ধ্যায় বললে, চললুম হে অশোক। সমস্ত দিন গায়ে যদি ভিজে তোয়ালে জড়িয়ে থাকতে হয় তাহলে হরদোই কি দোষ করলে ? চক্ষুওয়ালা আর হরদোই একই। অশোক অত্যন্ত সঙ্কুচিত কুণ্ঠিত বোধ করতে লাগলো, যেন চক্ষুওয়ালার আবহাওয়ার পরিবর্তনের জন্য সেই একান্তভাবে দায়ী, জবাবদিহি করাটা তারই। সে ভাবলে এঁরা মুসৌরিতে থাকবার মতো লোক, চক্ষুওয়ালায় নয়, কাজেই খাপ খেলে না।

মন্দা বাঁধাছাঁদায় ব্যস্ত হয়ে পড়লো। তারা থাকতে থাকতেই ছোটো বাঙালিয়াটা শ্রীহীন দেখাতে লাগলো। ঘর গোছাতে সময় লাগে, ঘর ভাঙতে কিছুমাত্র দেরি লাগে না। চক্ষের নিমেষে যেন গড়া-ঘর ভেঙে গেলো। মন্দা একদিন অশোক আর মিনিকে নিমন্ত্রণ করলে, মিনিও তাদের পাল্টা বিদায়ভোজ দিলে।

যাবার আগের রাত্রে মন্দা মিনিকে আলিঙ্গন করে বললে, অশোককে যেন একা ছাড়িসনে, এবার তুইও যাস ভাই। অনেক আনন্দ পেয়ে গেলুম এখান থেকে, অনেক কিছু পুঁজি নিলুম সংগ্রহ করে। বল যাবি, কবে যাবি? তুই না গেলে অশোক এখানকার মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে, আমার আর টেনিস শেখা হবে না। খেলাটায় নেশা ধরে গেছে আমার। লোকটিকে কিন্তু তুই বড্ডো স্ত্রৈণ করে তুলেছিস, ওর নুন-ঝাল মরে গেছে।

আবার হরিয়ানি বলদের গাড়ি চেপে সকলে ফিরলো। অশোক গেলো তুলে দিতে। মন্দা তাকে বললে, লক্সর পর্যন্ত চলুন, দেরাদুন থেকে বিদায় দিলে চলবে না। প্রমোদ এ প্রস্তাবে বাধা দিতে গেলো, বাধা টিকলো না, মন্দা ওদের দুজনকেই ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো।

ফুটবল কবে খেলে অশোকবাবু? বর্ষাকালে না? বর্ষা আর কার ঘর! এবার বুঝি চক্ষুওয়ালাতেই ফুটবল হবে, বলুন না? আজ যদি যেতেন! মন্দা গাড়ির জানলা থেকে কাঁধ পর্যন্ত বার করে কথা কইছিলো, মৃদু স্বরে বললে, চিঠি যদি লেখেন জবাব দেবো। লিখবেন চিঠি, না মিনিতে মেতে থাকবেন?

গাড়ি ছাড়লো, তার মৃদু গতির সঙ্গে অশোক জানলায় হাত রেখে এগোতে লাগলো। হঠাৎ মন্দা তার হাতটা ছুঁয়ে বললে, কি বলবো মনে করেছিলুম, বলা হোলো না, ও অশোকবাবু। কল্পনা করে নেবেন আপনি। পুনর্দর্শনায় চ বলবো নাকি? দর্শন আর পেয়েছি!

নমস্কার বৌদি, নমস্কার প্রমোদদা।

অচ্ছো বাবু, বাই বাই। রঞ্জু মা'র দেহের পাশ দিয়ে তার ছোট্ট হাসি-মুখটি বার করলে।

পরদিন সকালে অশোক অন্যমনস্কভাবে বারান্দা থেকে নামলো নিত্যকার অভ্যাসের মতো মন্দাদের বাড়ি যাবার জন্য। মনে পড়ে গেলো মন্দা নেই। 'নেই' কথাটার এতো গুরু অর্থ থাকতে পারে তা সে আজ প্রথম উপলব্ধি করলে। মন্দার কৌতুকভরা মুখ তার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে উঠলো, রঞ্জু বা প্রমোদ আর কাউকে অশোকের মনে পড়লো না। সে ফিরে এসে নির্জন বারান্দার আরাম-কেদারায় বসলো। এক মন্দা নানা বিভিন্ন ব্যক্তিতে বিভক্ত হয়ে তাকে ঘিরে দাঁড়ালো। অশোকের তখন বাহ্যিক দৃষ্টি নেই, দৃষ্টি অন্তর্লোকের রঙ্গমঞ্চটি ঘিরে আছে, সেখানে ক্রীড়ানিরতা মন্দা, ভাবালু গায়িকা মন্দা, রন্ধনরতা মন্দা, কৌতুকময়ী প্রহেলিকাময়ী মন্দা। অশোক মন্দার নানা মুখচ্ছবির ওপর মানসদৃষ্টি বোলাতে লাগলো। কাছাকাছি কোথাও স্নিগ্ধস্বরে ঘুঘু ডাকছিলো। কিন্তু অশোক শুনলে মন্দার নানা কণ্ঠস্বর—উচ্চাবচ, স্নিগ্ধ, প্রখর। চমক ভাঙতে মনে হোলো মন্দা তার মনকে লুঠ করে নিয়ে গেছে। সে ক্ষণিকের জন্য চোখ বুজে মনে মনে যেন তারস্বরে বলে উঠলো, মিনি মিণ্টি মিনা। ধ্যান করতে গেলো মিনির মুখ, কিন্তু তার ধ্যানচিত্তে আর মিনি নেই, সেখানে মন্দার অবাধ রাজত্ব। আবার তার মানসনয়নে মন্দার মুখ ভেসে উঠলো, মন্দা যেন দীর্ঘ আঁখিপল্লব সঞ্চালনে ইঙ্গিত ফুটিয়ে বলছে, ও অশোকবাবু, কিছু বোঝেন না কেন?

আমি তো আপনার চিত্তে; আমি তো আপনার হৃদস্পন্দনে; আমিই তো জড়িয়ে আছি আপনার রোমাঞ্চে আবেশে!

নিরন্তর বিস্ময়ের ঢেউ আসে আমাদের মনে কিন্তু সকল বিস্ময় উত্তেজনা আমরা মন দিয়ে ধরতে পারিনে; পারি যা হঠাৎ আমাদের সমগ্র বোধশক্তিটুকুকে বিমথিত করে জ্ঞানলোকে আলো আনে, জাগৃতি আনে। উপলব্ধির রাজ্যে হঠাৎ বোধ আর বুদ্ধির আবরণটি খুলে যায়। অশোক আগে ভেবেছিলো মন্দা অনেক ফাঁক রেখে গেছে তার অন্তরে, এখন উপলব্ধি করলে, সে যা রেখে গেছে তা শূন্যতা নয়; অশোকের মনের সহজ স্রোতে বাঁধ বেঁধে মন্দা আপনার চটুল প্রখর চিত্তধারাটিকে রেখে গেছে। অশোকের তখনো সংযমের, নিষেধের ঝোঁক একটু অবশিষ্ট ছিলো, সে মিনির খোঁজে ভেতরে উঠে গেলো।

উঠোনের ওদিকে ভাঁড়ার ঘরের বারান্দায় কাত্যায়িনী বড়ি দিচ্ছিলেন, মিনি এদিকে চেয়ে তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে কথা কচ্ছিলো। অশোককে দেখে মাথায় কাপড় তুলে দিলে, তার দৃষ্টিতে আহ্বানের ইঙ্গিত বুঝে মৃদু হেসে ডান হাতের পাতাটি তুলে জানালে, আসছি এখনি। অশোক বারান্দার নিভৃত কোণে ফিরে এলো। বারান্দা-ঘেরা নারঙ্গীলতায় তখনো ফুলের ফসলের শেষ প্রকাশ, বিষম ঋতুটার বাধা অগ্রাহ্য করেও এখানে-ওখানে ফুলের গুচ্ছ ফুটে আছে। মৌমাছির আনা-গোনায় অশোকের দৃষ্টি আটকালো। উড়লেই মৌমাছির পাখা উঠছে গুনগুনিয়ে। অশোক ভাবলে, আজ তার মনে ভাবনার হিল্লোল লেগে ক্রিয়া জেগেছে তাই তারও মন উড়ন্ত পাখা দুলিয়ে উঠছে গুনগুনিয়ে।

ও বৌদি ? মন্দা আস্তে আস্তে ফিরে দাঁড়ালো। জাপানীরা যেমন ঘরে একটিমাত্র চিত্র টাঙায় বিরলতার আবেষ্টনে চিত্রটাকেই সম্পূর্ণ প্রকাশ করবার, মহীয়ান করবার জন্যে, মন্দাকেও সে তেমনি বিরলতার পটভূমিকায় অধিষ্ঠিত করলে। ধ্যানচিত্ত ছাড়া মন্দার সে মহীয়সী রূপরচনাটুকু ধরা পড়বার নয়। ও বৌদি, খেলবেন এই সকাল বেলায় ?

এই তো খেলা, অশোকবাবু, উপকরণহীন আদিম চরম কেলি এই তো! অন্তরে-বাহিরে অঙ্গে-অঙ্গে রক্তকণিকায়-কণিকায় জাগেনি খেলা ? বলুন না ? ধরুন না আমাকে ! মন্দা ছুটে পালালো ; অশোক অনুসরণ করলে—লোকালয় থেকে বনে, বন থেকে নিভৃত গুহায়। ধরা পড়ে এলিয়ে-পড়া কোনো যাদুকরী যেন হেসে উঠলো খিলখিল করে, আবেগ ঘন-করা, পাগল-করা হাসি।

অশোকের চোখের সামনে চলচ্চিত্রে মন্দার নানা প্রকাশ নানা ভঙ্গি একটা অন্যের সঙ্গে মিলিয়ে যেতে লাগলো, তার উপলব্ধি আছে বর্ণনা নেই। তাতে গভীরতম অনুভূতির হৃদয় মন্থন করা সুখ-বেদনা আছে, বাক্যের প্রকাশ নেই। অশোক ধ্যানস্থ হয়ে রইলো।

অনেকদিন হয়ে গেলো মন্দাদের কোনো সংবাদ নেই। মিনিকে দিয়ে অশোক ডাকঘরের কৃপণ দানের বেদনা জানতো, এখন তার মনে ডাকের সময়ে মন্দার প্রতীক্ষার বেদনা জেগে উঠলো। সে ভাবতো, আমিই লিখি আগে, কিন্তু কি লিখবো। কয়েকদিন ইতস্তত করে

অশোক চিঠি লিখলে, ও বৌদি, দুঃখ হচ্চে এখানে টেনে এনে আপনাদের ভ্রমণসুখ নিষ্ফল করলুম। কিছুই পেলেন না এখানে—না আরাম, না আনন্দ! নিজেকে অপরাধী মনে করি তার জন্য।

ফেরত ডাকে মন্দার চিঠি এলো, পেয়েছি অশোক বাবু, অনেক পেয়েছি চক্ষুওয়ালায়। শুধু আমার চোখ খোলেনি সেখানে, দৃষ্টির নূতন পরত খুলে গেলো। আপনার মতো বন্ধু পেলুম—নর্মসহচর, মর্মসাথী। সে কি কম পাওয়া অশোকবাবু? বর্ষা নেমেছে হেথায়, ওখানেও কি শ্রাবণনিশি এমনি অন্ধকার? ওখানেও কি লুব্ধকরা মুগ্ধকরা জলছলছল সুর বাজে? বর্ষা নিশীথে মনে কি পড়ে যায় এই প্রগল্‌ভাকে?

ডাকঘর সদয় হয়ে উঠলো। অশোকের চিঠি লিখতে ভয় করে, লেখে কম। মন্দার চিঠি আসে ঘন ঘন।

ও অশোক বাবু, কাজল মেঘের ভেলায় বাণী পাঠালুম :

পিয়া সে কহিও আওন কি খণ বীত ন যায়
বরখা ঋতু আ গঈ রে।
লিখি লিখি পতিয়া ভেজ পাঠাওয়ে
পিয়া-কো যা কে পঢ়-কে সুনাওয়ে
দাদুর বোলে পাপিয়া ন বোলে,
হমারি রসকুম্ভ বিফল ন যায়।

আবার চিঠি আসে—অস্তি রবিঠাকুর নামে এক গানের রাজা। তাঁর গান শিখছি গুশলখানার নিভৃতে, নলবাহী জলধারার বাঁধা কড়ি মধ্যমকে

আঁকড়ে ধরে, মধ্যস্থ করে। গানটি দিলুম পাঠিয়ে ; স্বকীয় মধুর রসে সেটা আপনার অন্তরে সুরবিস্তার করবে—

বড়ো বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে।
কোথা হতে এলে তুমি হৃদি মাঝারে।
তোমারে দেখেছি যেন বাজে স্বপনে
তুমি চির পরিচিত চিরজীবনে।
তুমি না দাঁড়ালে আসি
হৃদয়ে বাজে না বাঁশি
কতো হাসি কতো আলো ডোবে আঁধারে।

ও অশোকবাবু, কবে আসবেন ?

আবার চিঠি এলো, গান শিখেছি নূতন, শুনবেন ? যদি কারো নিঠুর 'আশিক' হন আপনি গালিবের মর্মবেদনা আপনার অন্তরে আঘাত করবে :

ইশ্‌ক্ পর জোর নহি
য়হ্ হ্যয় বহ্ আশিক গালিব—
যো লগায়ে ন লগে
অওর বুঝায়ে ন বনে।

যে গালিব গায় গালিবের দুঃখ তারও অশোকবাবু !

নীলাকাশে বকের পাঁতি উড়ে যাবার ক্ষণে আবার চিঠি আসে, অশোক, কি ভাবছি জানো এই বাদল-ঝরা মৃদঙ্গমুখর রাতে—

যেন দূরের মানুষ এসেছে আজ কাছে
তিমির আড়ালে নীরবে দাঁড়ায়ে আছে।
গলে দোলে তার বিরহ ব্যথার মালা
গোপন-মিলন অমৃতগন্ধ ঢালা।
মনে হয় তার চরণের ধ্বনি জানি
হার মানি তার অজানা জনের সাজে।

ও অশোক, তোমার চিঠি নেই যে! আর বুঝি ভাবো না আমায়, মিনির খেলায় মেতে আছো? কাল তোমার হয়ে নিজেকে কি লিখেছি জানো? লিখেছি

যদি জল আসে আঁখিপাতে
একদিন যদি খেলা থেমে যায় মাধবীরাতে
তবু মনে রেখো।

কতোদিন আর আমার গানের ওপারে থাকবে, ও অশোক? শুনেছি অলকনন্দার মতো মন্দাকিনী স্বর্গনদী, তার অন্তরেও টান আছে ভূতলের সাগরের জন্য। ডেকে আনো না সেই ভগীরথকে যে মন্দাকিনীর স্বর্গচ্যুতি ঘটাবে!

এক পেয়ালা চা নিয়ে মিনি এলো, বসলো আরাম-কেদারার বাজুতে। চা খেয়ে অশোক নিজেকে সঙ্কুচিত করে কেদারার আসনে জায়গা করে দিয়ে বললে, এইখানে এসো না!

না না, এখন না; কেউ এসে পড়বে। হ্যাঁগো, মন টিকছে না, না?

টিকবার কথাও নয়। আগে যখন চক্ষুওয়ালায় খেলা ছিলো না তখন তোমার তৃপ্তি ছিলো, আর কি সে তৃপ্তি পাবে?

অশোক বাঁ হাত দিয়ে নিবিড় করে মিনির কটিদেশ জড়িয়ে ধরে মুখ তুলে শুধু হাসলে; সে মিনির জিজ্ঞাসার উত্তরটা এড়িয়ে গেলো। জিজ্ঞাসাটা বিপজ্জনক, উত্তরে স্বীকৃতির কঠিন দায় আছে।

মিনি আবার প্রশ্ন করলে, বলো না গো, জগতে এতো অনিয়ম কেন, একের মধ্যে সকল প্রয়োজনের মতো করে আয়োজন হয়, না কেন?

মিনির এই নূতন রূপ দেখে অশোক বিস্মিত হোলো। এ ভাষা তো মিনির মুখে ছিলো না। মিনি ছিলো শুধু বধূ, লজ্জা সঙ্কোচ ছিলো তার একমাত্র পরিচয়। অশোক বললে, কিসের আয়োজন মিণ্টি?

মিনি হেঁট হয়ে অশোকের মুখের পাশে নিজের মুখটি এনে মাথা দুলিয়ে বললে, জানোনা তুমি? তার গালে গাল রেখে আবার বললে, আমি কেন গান জানলুম না, টেনিস খেলতে পারলুম না, রসে ভরে উঠলো না কেন আমার মন? যুবতী মনের নূতন অনুভূতির সহস্র প্রশ্নের একটি চিরন্তন প্রশ্ন। মিনির নূতন বয়ঃসন্ধির উপলব্ধি। অশোক আর কি বলবে! তার মনে পড়ে গেলো মিনির মন আর চৈতন্যশূন্য নয়। সে মুখে বললে, তোমাতেই তুমি পূর্ণ মিনি!

না গো, না, পূর্ণ নই। মিনির মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো, তোমার গৃহস্থালিতে হয়তো পূর্ণ আমি, কিন্তু তোমার মৃগয়ায় আমি কেউ নই। তার মুখে এ ভাষা আপনি এলো। বড়ো বড়ো কথা বলে মিনি লজ্জিত

হোলো যেন। তার বিচরণ সহজের রাজ্যে, সীমা লঙ্ঘন করার লজ্জাটা কম লজ্জা নয়।

যদি মন্দার সম্বন্ধটাকে অশোকের পতনের কারণ বলা যায় মিনি সে পতন নিবারণ করতে পারলে না, করবার চেষ্টাও করলে না। দিন কয়েক তার খেয়াল হোলো বই পড়ে আত্মোন্নতি করবে, আত্মোন্নতি এলো না সে পথে। মন্দার মতো করে সে অশোকের সঙ্গে কথা কইতে ..লো, দেখলে তাতে সে নিজে মেকি হয়ে গিয়ে নিজে নিভে গিয়ে মন্দাকেই প্রকট করে তুলছে। মন্দা সত্যই ভেবেছিলো মিনিটা বোকা, ছলাকলার কারবারেও নেই, তার কোনো প্রকাশ পুরুষের রোমাঞ্চ ঘটাবার মতো নয়, কিন্তু মিনির চোখে মন্দার যতোটুকু পড়েছিলো সে সবই বুঝেছিলো, আপত্তি তোলেনি তার কারণ ঈর্ষা জাগেনি তার মনে, ঈর্ষা জাগবার মতো মনও তার নয়। অশোককে সন্দেহ করবার, আঘাত করবার বেদনা দেবার দায়িত্বটা যে কি তা মিনি পূর্বাহ্লেই জেনেছিলো। কিন্তু সংঘর্ষণের অগ্রদূত সামনে, সেটাকে এড়াবার জো ছিলো না। চুমো খাবার ঘটনার রাত্রে মন্দাকে উদ্দেশ করে সে মনে মনে বলেছিলো, আমিও মেয়ে মন্দাদি, আমিও প্রকৃতি-নটি, সংস্কারে কলাবতী। সংসার আমাকেও একদিন শিখিয়ে নেবে। মিনির এ কামনা জেনেছিলেন শুধু ওর অন্তর্যামী।

নাবিক সুদীর্ঘকাল সমুদ্রের বুকে বিচরণ করে বেড়ালে রোগাক্রান্ত হয়, সে রোগের বৈশিষ্ট্য আছে। কঠিন মাটি আর বুঝিবা ঘরের চিন্তায় নাবিক আর সীমাহীন জলরাশি দেখতে পায়না, তার চোখে অধ্যাস জাগে, মায়া

জাগে। জলরাশি তৃণাচ্ছাদিত ভূমিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। সেই ভূমিতে সে ক্রমাগত নিজের ঘর প্রিয়জনকে দেখে দেখে একদিন উন্মাদ হয়ে যায়। রোগটির নাম ক্যালেঞ্চর (Calenture) ; তার সঙ্গে দিবসে জাগ্রত অবস্থায় স্বপন দেখার কিছু সাদৃশ্য আছে। যদিও দিবাস্বপ্ন নিদান শাস্ত্রের অন্তর্গত কোনো রোগ নয়। উন্মাদনাও কিছু আছে দিবাস্বপ্নে, সে উন্মাদনার মোহ আছে, প্রভূত রসও আছে, আর বুঝি বা আছে অবচেতনার কামনা পূরণ করে নেবার প্রয়াস।

দূন উপত্যকায় গরম ঝোড়ো লূ-এর আনাগোনা কম। মন্দারা ফিরে যাবার পর গরম বাতাস বইতে আরম্ভ করলে হরদোই-এর মতোই গাছ পাতা ঝলসে দিয়ে, উপত্যকার বিস্তীর্ণ চোখ জুড়ানো সবুজ স্নিগ্ধ তৃণভূমিকে বিবর্ণ করে। সে প্রাকৃতিক দৌরাত্ম্যকে ব্যর্থ করে মহিমান্বিত হয়ে রইলো শুধু পুষ্পিত কৃষ্ণচূড়া আর পত্রবিবর্জিত কিন্তু গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে ফুলে ছাওয়া শাল্মলীতরু।

অশোক আর মিনি দুপুরবেলা জানলা-দরজা বন্ধ অন্ধকার ঘরে বিশ্রাম করতো। বাইরের তাপ হয়তো সহ্য করা যায়, কিন্তু সূর্যালোকের তীব্র দ্যুতি অসহ্য। অন্ধকার শীতল মেঝেয় মাদুর পেতে ওরা দুজনে দিন কাটাতো। সেদিন মিনি নিদ্রিত, অশোকের চোখে ঘুম নেই, তবুও স্বপ্ন জেগে উঠলো তার চোখে। কতো দিন সে দূরাবস্থিত মিনি, পার্শ্বশায়িতা মিনিকে দিবাস্বপ্নে নানারূপে পেয়েছে। আজ পাশে থেকেও মিনি দূরে গেলো। ধীর পাদবিক্ষেপে অশোকের চিত্ততলের প্রফুল্লিত রঙ্গমঞ্চে মন্দা এসে দাঁড়ালো—আঁটসাঁট করে অঙ্গে তার ডুরে শাড়ি জড়ানো।

যেন বয়নশিল্পী কেউ আগ্রহান্বিত রেখার বাহু দিয়ে তার সুঠাম বঙ্কুর দেহটি আলিঙ্গন করে রয়েছে। মন্দার নানা প্রসাধন অশোক দেখে-ছিলো। কিন্তু এই যত্নশূন্য কারুকলাহীন খেলার সাধাসিধা সামান্য বেশটি তার সব চেয়ে ভালো লাগতো, তার চক্ষু দুটি প্রসাধনবিহীনা মন্দার দিকে অপলক চেয়ে থাকবার জন্য পিপাসিত হয়ে উঠতো।

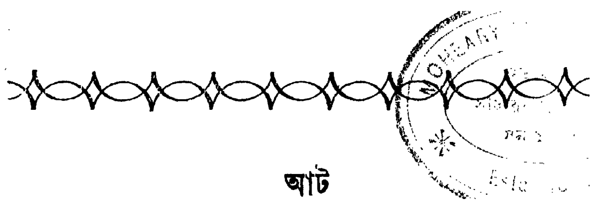
মন্দা তাকে ধ্যান দিয়ে প্রিয়ার নিতি নব-নব রূপ দেখার কথা বলে-ছিলো। মন্দা ভরে তুললে তার ধ্যানলোক। অশোকের তদ্গত মনের মুখে ভাষা ফুটে উঠলো, মন এ-দেশী হিন্দুস্থানী সৌজন্য প্রকাশের ভাষায় বললে, ও-বৌদিদি, বলুননা, কি সেবা করবো ?

করবেন সেবা ? ও অশোকবাবু ? মন্দা মুখে আঁচল দিয়ে লীলা-কৌতুক-ভরে হেসে উঠলো। বলুন না, করবেন সেবা ?

হুকুম দিন না বৌদি !

দেবো ? সাগর-বৌকে জানেন, অশোকবাবু ? দেবী চৌধুরাণীর সতীন ? অশোক চমকে উঠলো। ব্রজেশ্বর তার পদসেবা করেছিলো, আপনি পারেন ? ও অশোকবাবু ? কলহাসির বিজলী খেলে গেলো আকাশে। মন্দা চকিতে পিছু ফিরে দাঁড়ালো মারাত্মক ভঙ্গিমায়। অশোকের চিত্ত-তলের নিষেধের শেষ অস্ফুট আপত্তি জানিয়ে বললে, অশোক, চেয়োনা ও কলা-বিচক্ষণার পানে। তার উদ্দাম রক্তস্রোতে নিষেধ গেলো ভেসে। অশোকের দৃষ্টি পড়লো মন্দার কোমল রোমাবলি ঢাকা ঘাড়ে, ডুরে শাড়ির সর্পিল রেখার-পথে তার দৃষ্টি পরিক্রমায় রত হোলো, গুরু-নিতম্ব বেষ্টিত লুব্ধ রেখায় রেখায় তার দৃষ্টি গেলো হারিয়ে।

যুগযুগান্তর ধরে পুরুষ এ স্রোতে ভেসে গিয়েছে, কূল মেলেনি কোনোদিন। অশোকও ভেসে গেলো, তার ধ্যানচিত্তে শুধু প্রখর অনুভূতি রইলো ভেসে যাবার।



আট

জুলাই মাসের মাঝামাঝি একদিন সন্তোপ্রাপ্ত একটা চিঠি হাতে নিয়ে অশোক মিনির কাছে গিয়ে বললে, মিনি, রামলাল ক্যপ ফুটবলের ডাক এসেছে। জুবিলি ক্লাব মনে করিয়ে দিয়েছে এবারও তাদের হয়ে খেলতে হবে; এইবার চলো ফিরে যাই।

মিনি এ-ডাকের মানে জানতো, মুচকি হেসে তবুও বললে, তার তো দেরি আছে, সেই অগস্ট-সেপ্টেম্বর মাস। এখনি যাবে?

হাত-পায়ের মরচে ছাড়াতে সময় চাই না? এখানে এনে তুমিই তো সর্বাঙ্গে মরচে ধরিয়ে দিলে! কি বলো যাবে? মাকে তুমি খবরটা দাও।

কথাটা মনঃপূত হোলো না বুঝি? মিনির চিবুক ধরে নাড়া দিয়ে অশোক আবার বললে, তুমি না গেলে আমার খেলার উৎসাহ থাকবে না, মন এখানেই পড়ে থাকবে, তোমারই আনাচে কানাচে অবিশ্রাম ঘুরে বেড়াবে।

এখনো বেড়াবে? আর বেড়াবে বলে মনে নিচ্চে না তো! মিনি মৃদু হাসলে।

অশোক তার কথাটি ধর্তব্যের মধ্যে না এনে মিনির কাঁধ একহাতে বেষ্টন করে বললে, এবার তোমাকে খেলা দেখাতে লক্ষ্ণৌ নিয়ে যাবো, কেমন? মাঠের ধারে বসে তুমি যদি আমার খেলা দেখো, সে-খেলা সার্থক হবে,

আমার দল জয়ী হবে। গতবারে রেলের সাহেবদের কাছে হারলুম। তারা বার বার জিতে যায় কেন জানো? তাদের প্রত্যেক খেলাড়ীর একটি দুটি বা বহু প্রিয়তমারা মাঠ ঘিরে বসে জ্বলজ্বলে চাউনি আর হাসি দিয়ে তাদের উৎসাহিত করে বলে!

সেইদিন থেকে অশোক স্কিপিং দৌড় পাহাড়ে-চড়া শরীরচর্চায় লেগে গেলো। ব্যায়ামের সময় মিনি সে স্থানে গিয়ে বসলে অশোক বোলতো, মিনা, বলতে পারবো না—'রমণীতে নাহি সাধ, রণজয় গাওরে'। সাধনার কালে আমার লোভকে ঠেকিয়ে রেখো। তুমি বড্ড লোভ দেখাও, দেখাও না?

মিনি রক্তিমমুখে 'যাঃ' বলে দ্রুতপায়ে স্থানত্যাগ করতো। তার অভিজ্ঞতা ছিলো অশোকের এই শরীরসাধনার মাঝে তার স্থান নেই। সাধনার কালে অশোক তার মনের সীমান্ত দেশটি যেন দুর্লঙ্ঘ্য পাঁচিলে ঘিরে দেয়। আবহমানকাল থেকে নারী তপস্যার বিঘ্ন। শুধু তাই নয় পুরুষের তপস্যা ভঙ্গ করবার তার সহজ প্রয়াস আনন্দ আছে। মিনি কিন্তু চিরাচরিত অপ্সরাপৃষ্ট পথ দিয়ে গেলো না। সে টান-টান করে চুল বেঁধে, ভ্রূভঙ্গি সহজ করে, কটাক্ষ সম্পূর্ণ বর্জন করে, সাদামাঠা কাপড় পরে আটপৌরে মেয়েটি হয়ে গেলো।

সেদিন হরদোই পৌঁছে অশোক মিনিকে বাড়িতে রেখেই বাইক চড়ে বেরিয়ে গেলো। বর্ষা নেমে হরদোই স্নিগ্ধ, রাস্তার দুধারে গাছপালা সবুজে ছাওয়া। মন্দার বাড়ি পৌঁছে একটা দেওয়ালের গায়ে বাইকটা রেখে অশোক একটা চাকরকে অঙ্গুলির ইঙ্গিতে ডেকে বললে, মেমসাহব

কো খবর দো। একটু এগিয়ে যেতেই শুনতে পেলে বাথরুম থেকে মন্দার গান আসছে :

দিলে নাদাঁ তুঝে হুয়া ক্যা হয়।

আখির ইস্ দর্দ কী দওয়া ক্যা হয়?

বাথরুমটা হাতার রাস্তার ধারে, অশোক কাছাকাছিই দাঁড়িয়ে ছিলো। চাকর ভেতরে যাবার আগেই স্নানঘর থেকে মন্দা উচ্চকণ্ঠে বললে, কান খাড়া করেছিলুম সকাল থেকে, আসচি আমি। গোলকামরায় বসুন গিয়ে, ও অশোকবাবু!

কয়েকমিনিট পরে সদ্যস্নাতা আলুলায়িত কুন্তলা মন্দা এলো স্নিগ্ধ হাসির ডালি নিয়ে। সে দ্রুতচরণে অশোকের পানে এগিয়ে এসে হঠাৎ মাঝপথে থেমে গেলো। অশোক উঠে দাঁড়ালো। তারও মুখে হাসি। নমস্কার বৌদি। কেমন আছেন জিগগেস করবার হেতু খুঁজে পাচ্ছিনে কিন্তু!

মন্দা কৌচের এক কিনারায় বসে পড়ে বললে, তুমি বড়ো আশাভঙ্গ করো অশোক। ভেবেছিলুম প্রণাম করবে, কিন্তু যা আমার কপাল! প্রণাম নিতে বেশ লাগে কিন্তু এমন কেউ নেই যে তা করে। যারা বৌদি বলে ডাকে তারাও ফাঁকি দেয়, দেয়না কি?

অশোক হাসলে, বললে, আচ্ছা, মনে মনে করলুম। প্রমোদদা কই? মন্দা মুখে আঁচল দিলে; উজ্জ্বল চোখে বললে, ভয় নেই, বন্দরে কোনো তরী নেই আর। সুবিধে করে দিয়ে উনি কাছারি গেছেন। সে খিলখিল করে হেসে উঠলো।

আঃ, কি যে বলেন আপনি!

যাকগে ও-কথা। ও অশোক, চা খাবে? কবে এলে, কখন এলে? মিনিকে কার হাতে দিয়ে এলে? ওমা, এই আসছেন! চা নয়, তাহলে ভাত খান। যান স্নান করে আসুন। সাহেব-বাড়ি, ধুতি নেই, শাড়ি পরতে হবে কিন্তু। আচ্ছা, অশোকবাবু, আমি ভারি মজার—নয়? 'আপনি' বলছি, 'তুমি-'ও বলছি। আমার চিত্তদোলা থামেনি কিনা! বলোনা কি বলবো, কি তোমার পছন্দ?

গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে বৌদি, এখন কি মাথা খেলে? বেশ তো, দেখুন না দোল-খাওয়া কোথায় এসে থামে! ভারকেন্দ্র আপনিই ঠিক করে দেবে ব্যবধান-নৈকট্যের সমস্যা!

বেশ চিঠি লেখো তুমি কিন্তু। আমার জীবনের একটা অভাব পূর্ণ করে দিয়েছো। বারবার পড়ে চিঠিগুলো মুখস্থ হয়ে গেছে। ওমা, চা-র কথা বলিনি যে! বলে আসি।

ফিরে এসে স্বস্থানে বসে মন্দা বললে, একটা কথা বলি, ডাইনীর নজর বলে মনে কোরোনা যেন। দেহ তোমার চমৎকার আঁট হয়ে গেছে আগেকার চেয়ে। মনে হচ্ছে অনেক গতি সঞ্চয় করে ফেলেছো ইতিমধ্যে।

দরকার হয়েছে বৌদি। সামনে ফুটবল, অনেক পুঁজির দরকার।

অশোক চা খেতে লাগলো, মন্দা তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো। চা খাওয়া শেষ হতে মন্দা বললে, আমি এবার তোমার খেলা দেখবো কিন্তু, তা বলে রাখছি।

অশোক প্রসন্ন হয়ে হাসলে, বললে, তার মানে লক্ষ্ণৌ যাবেন খেলা দেখতে? আমি রাজী আছি।

এখানে দেখা যায় না?

যায়। কিন্তু সেটা অভ্যাসের ব্যাপার। জীবন-মরণ পণ করা কিছু নয়।

তা হোকগে। হঠাৎ ঘড়ির দিকে মন্দার চোখ পড়লো। দেড়টা? কী সর্বনাশ! তুমি বাড়ি যাও, শিগগির ওঠো বলছি। মিনি আর তোমার মা'র অভিশাপ আমি কুড়োতে পারবো না। আমারো খিদে পেয়েছে।

অশোক উঠে পড়ে হাসিমুখে বললে. বেশ চললুম। তাড়িয়ে দিচ্ছেন তো?

তাড়ালুম কি? তাড়াইনি। বরং বললুম—আবার এসো দীর্ঘ অবসর নিয়ে আমার প্রশস্ত অবসর বেলায়; বললুম না?

অশোক বাইরে এলো, মন্দাও এলো সঙ্গে সঙ্গে। বাইক ফটকের কাছে যেতে মন্দা কণ্ঠস্বর উচ্চ করে বললে, আবার আসবেন অশোকবাবু, এবার মিনিকে নিয়ে আসবেন।

মিনি স্নানাহার করে খাটে কাত হয়ে শুয়ে একটা বইএর পাতা ওলটাচ্ছিলো। অশোক তাকে গন্তব্যস্থানের কথা বলে যায়নি তবুও মিনি জানতো সে স্থানটা কোথায়। বইএর পাতায় এক জায়গায় তার চোখ পড়ে গেলো, সে পড়লে:

আরো চাই যে আরো চাই,
ভাণ্ডারী যে সুধা মোরে বিতরে নাই—

সে নিজের মনে তার বিষয়ে ভাণ্ডারীর কৃপণতার তালিকা তৈরি

করছিলো, এমন সময়ে অশোক ঘরে এলো। জামা খুলতে খুলতে বললে, ভয়ানক খিদে মিন্টি। আমি নেয়ে আসছি এখুনি।

মিনি নড়লো না, বললে, ভাত-তরকারি ফুরিয়ে গেছে। মা খেয়েছেন। বাড়ির আক্কেলবিহীন মানুষটির প্রতি যথেষ্ট কটুক্তি করে আমাকেও খাইয়ে দিয়েছেন।

অশোক হাসলে, রাগ হয়েছে বুঝি?

মিনিও হাসলো, যাঃ, রাগ হবে কেন! নাই খেলে আজ। শুনেছি মন ভরা থাকলে ভাত-ডালকে তুচ্ছ করা যায়, খিদে থাকেনা।

অশোক মিনির মাথায় হাত রেখে নাড়া দিয়ে তার গালে চিমটি কেটে স্নানাহার করবার ও মায়ের বকুনি খাবার উদ্দেশ্যে চলে গেলো। মিনির মনে বাক্যটা গুঞ্জরণ করতে লাগলো—'ভাণ্ডারী যে সুধা মোরে বিতরে নাই।' মনে মনে বার বার আবৃত্তি করতে করতে পদটায় তার মন-গড়া নির্বাক একটা সুর যোজিত হয়ে গেলো।

জুবিলি ক্লাব লক্ষ্ণৌএ। অভ্যাস করবার জন্য অশোক হরদোইএর একটা ক্লাবে ফুটবল খেলতো। সেদিন খেলা-শেষে বাড়ি ফিরে সে নিজের ঘরের পাশের বারান্দায় গেলো বুট পাজামা ইত্যাদি না খুলে। জানতো মিনি সেখানে আছে। বারান্দার নিচে গন্ধরাজের সারি, নক্ষত্রের মতো শাদা ফুলে ঘন সবুজ গাছগুলো ছেয়ে আছে। তাদের উগ্র মধুর অলস-করা গন্ধে ভুবনভরা। অশোক মিনিকে দেখে অবাক হয়ে গেলো। আলোর সমুখে বসে সে সূচি-কার্য করছে। মিনির চুল অনেক, চুলের প্রসাধন লক্ষ্য করবার মতো। গায়ে অরগ্যাণ্ডির জামা, পরণে শান্তিপুরী ডুরে শাড়ি

অশোক মুগ্ধ হোলো, তাকে একদৃষ্টে দেখে বললে, মিনি, আনন্দমঠ পড়েছো তো ? আমিও আজ ভবানন্দের মতো বলছি, ধর্ম ?—যাক অতল জলে ! সংযম ?—অতল জলে ! ব্রত ?—তাও যাক অতল জলে ! থাকগে ফুটবল।

তার নিবিড় আলিঙ্গনের ভেতর থেকে মিনি চুপি চুপি জিগগেস করলে, আমাকে নিয়ে মন্দাদির বাড়ি যাবে বলেছিলে যে ? যাবেনা ?

মন্দাদি ? কে সে আমার ? আমার গরজ কি তোমাকে নিয়ে যাবার ?

রাত্রি এগারোটার সময়ে অশোকের খেয়াল হোলো স্নান করতে হবে, কাপড় বদলাতে হবে। সে উঠে গেলো। মিনি ভাণ্ডারীকে মনে মনে প্রণাম জানালে, কৃপণ বলেছি তোমায়, দোষ নিও না ঠাকুর ! কিন্তু সত্যিই আরো চাই, আরো অনেক চাই। ওর চেয়ে আমাকে ধনী করো, আমাকে পূর্ণ করো আগুন দিয়ে, সকল শাণিত আয়ুধ দিয়ে।

কয়েকদিন পরে অশোক খেলতে যাবার পথে মিনিকে মন্দার বাড়িতে দিয়ে গেলো, বলে গেলো, ফেরবার সময়ে নিয়ে যাবো।

সে সন্ধ্যায় এসে দেখলে বাইরে কেউ নেই, প্রমোদও টেনিস খেলে বাড়ি ফেরেনি। অশোক মন্দাকে ডাকতে ডাকতে রান্নাঘরের দিকে গেলো। তখন গোধূলি বেলা। মন্দা তার সাড়া পেয়ে বেরিয়ে এসে বললে, আসবেন না যেন এদিকে। নতুন একটি যুবতী পাচিকা পেয়েছি আজ, আপনাকে দেখলে লজ্জা পাবে, না হয় আমার হাতছাড়া হয়ে যাবে।

দেখবেন তাকে ? আহা, দেখুন না, দেখবার মতো। ওরে, একবার বাইরে আয় তো ?

মিনি খন্তি হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলো। যে-বেশে সে অশোকের সঙ্গে এসেছিলো তার সে-বেশ নয়। অঙ্গে ধূপছায়া রঙের বারাণসী, লক্ষ্ণৌয়ের চিকনের কাজ-করা একটা জামা। মিনি অশোককে দেখে হাসলে।

মন্দা জিগগেস করলে, সত্যি বলিনি কি ? বলুন তো, রাঁধুনীটি কেমন ? লোপাট করে নিয়ে যাবার মতো ? নয় কি ? হাঁ করে দেখছেন কি ? মন্দা মিনির কাঁধ জড়িয়ে ছিলো, হঠাৎ তাকে সশব্দে চুম্বন করলে।

অবাক করলে মিনি ! বৌদির কাপড় পরেছো তা বুঝলুম। কিন্তু বাংলা থিয়েটারেও যে রাঁধুনীর এমন বেশ হয়না !

মন্দা বললে, পাড়া বেড়াতে গিয়েছিলুম, এ কথাটা বুঝলেন না ? তা যাকগে, পরোটা খাবেন ? ইরাণী পরোটা। আমার মতো বাঙালির হাতে ও-পরোটা ওৎরায় না তো, তাই আসল ইরাণীর অভাবে ইরাণীবরণ মিনিকে দিয়েই তৈরি করাচ্ছিলুম। বলুন না খাবেন কি না ?

মানুষ না হয়ে যদি দেবতা হয়ে জন্মাতুম আমার নাম দেব অগ্নিগর্ভ বলে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের সঙ্গে একযোগে ত্রিভুবনে ধ্বনিত হোতো বৌদি ! রামায়ণ মহাভারত আমার নামগানে ভেসে যেতো। খাবোনা কোন দুঃখে ?

ওই উনি আসছেন, আপনি পালান এখান থেকে। আমার রাঁধুনীর মন একে সুপুরুষ সংসর্গে উড়ু উড়ু করছে। পরোটা পুড়ে না যায় ! মিনি স্মিতমুখে চোখ নামিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে গেলো। প্রমোদ এদিকে

আসছিলো, মন্দা বললে, ওগো, আর এগিও না। খু-ব সস্তায় চমৎকার একজন রাঁধুনী পেয়েছি, তার হাতে খেলে আর পুনর্জন্ম হয়না। তবে একটু অসুবিধেও আছে। তার আঁচল-ধরা স্বামীটিকেও তোয়াজ করতে হবে; হ্যামক একটা টাঙিয়ে দিতে হবে রান্নাঘরের পাশে, তবে যদি রাখতে পারি।

প্রমোদ আর অশোক মাঠে বসলো। বেয়ারা প্রমোদের সন্ধ্যাকালীন উপকরণগুলি সাজিয়ে রেখে গেলো। মন্দাও এলো অশোকের জন্য পরোটা নিয়ে। প্রমোদ বললে, অশোক, আমাদের ছাড়লে কেন? বিলিয়র্ডস্ ছাড়লে, টেনিসও ছাড়লে!

মন্দাও বললে, আমারও নালিশ আছে অশোকবাবু। চক্ষুওয়ালা থেকে এসে পর্যন্ত বেণীর খোসামোদ করে টেনিস শিখলুম, সে কি শুধুই? আপনি কবে খেলবেন?

আর ক'টা দিন বৌদি! ফুটবলটা চুকিয়ে নি। ফুটবলের খাতিরে বিকেলে সব বাদ দিয়েছি।

আমার দেখার কি হোলো? ওগো, অশোকবাবুর ফুটবল দেখবে একদিন? বেশ তো বৌদি। কাল চলুন না স্কুলের মাঠে, বার্কশায়র রেজিমেণ্টের সঙ্গে খেলা আছে।

পরদিন সকালে অশোক মন্দাকে খেলা দেখার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে এলো। মন্দা তার থুতনিতে স্টিকিং প্লাস্টরের তালি দেখে আকৃষ্ট হয়ে জিগগেস করলে, দস্যি তুমি তা জানি। কিন্তু অমন জায়গায় কাটলো কি করে? মন্দার চোখ ঝিকমিক করে উঠলো, সে বললে, কি জ্বালা

বল তো! সকাল বেলায় আবার কবীরের দোঁহা মনে পড়ে গেলো:

'দিন কো মোহিনী, রাত কো বাঘিনী—
পলক পলক লোহু চোষে—'

কোনো বাঘিনী নখরদংষ্ট্রাঘাত করেনি তো, ও অশোক? নিঃশব্দ বাজ পড়লো মন্দার চোখ থেকে। নিমেষার্ধ সময়ে মন্দা দেহটি বিচিত্র লীলায় লীলায়িত করে ঘুরে স্থান ত্যাগ করলে। অশোকের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো, তার সবল হাঁটু দুটো যেন শিথিল হয়ে গেলো। ভেতর থেকে মন্দা বললে, আসচি, পালিও না যেন।

সে ফিরে এলো পান-চা হাতে নিয়ে নিতান্ত ভালো মানুষটির মতো। চা দিয়ে বললে, শুনছি এখন তোমার রণজয়ের গান চলছে, রমণীতে সাধ নেই। মন্দা হাসলো। ও-সাধে পরকালটি ঝরঝরে হয়ে যায় বটে কিন্তু ওতে অনন্ত সুধা আছে গো ঠাকুর! বলোনা—কাটলো কি করে?

ও কিছু নয় বৌদি। সকালে ডনোহিউএর সঙ্গে বক্সিং করতে গিয়ে একটু লেগে গেছে, অমন নিত্য যায়।

মন্দা মুগ্ধনয়নে অশোকের মুখের পানে ক্ষণিক চেয়ে রইলো, তারপর কণ্ঠস্বর মৃদু করে বললে, কতো যে খুশি করো তুমি, তা কি বলবো! পুরুষকে দেখার আনন্দ কোনখানে জানো? তার শৌর্যে, সাধনায়, নিষ্ঠায়, তার শক্তির প্রকাশে। রণের বীর্য, দুঃখ সহ্য করবার বীর্য— সব দেখেই আনন্দ, নয়? তোমাকে তোমার সমগ্রতায় দেখতে পাচ্ছি

অশোক। কি রকম সমগ্রতা জানো? ব্যক্তিত্বের সমগ্রতা, যা তোমার দেহের সীমানা ছাড়ানো।

অশোক মন্দার মুখের দিকে চেয়েছিলো, কোনো উত্তর না দিয়ে মৃদু হাসলে।

মন্দা বললে, বুঝলে না? চিত্রকর দেবদেবীর মুখের চারদিকে ছটার মণ্ডল আঁকে দেখেছো? যদিও ভুল করে, কারণ ওই ছটাই ব্যক্তিত্বের জ্যোতি। শুধু মুখমণ্ডল নয় সমগ্র দেহটি তা বিকীর্ণ করে। মানুষের চেয়েও ব্যক্তিত্ব বড়ো। বিরাট মানুষ যারা তারা দেখতে হয়তো এতোটুকু, কিন্তু তাদের ছটা যদি দেহের অঙ্গ হতো, দেখতে পেতে তা পৃথিবী ছাওয়া।

ও-সব ভেল্কির বুলি আমি বুঝিনে বৌদি।

তা না বোঝো! কিন্তু তোমারও আছে শক্তির ছটা। ও অশোক, শক্তিপ্রকাশে তোমাকে মুগ্ধ হয়ে দেখেছি। দেখবো তোমায় তোমার বীর্যে। আমি তোমার ঘুসো-লড়া দেখবো, যে-লড়া সত্যি, যাতে রক্ত-মোক্ষনের সম্ভাবনা আছে। কবে দেখবো?

সে আর বেশি কথা কি! একদিন দেখলেই হোলো।

তোমার কুস্তি লড়াও দেখবো কিন্তু।

অশোক শিউরে উঠে দুহাতে মুখ ঢাকা দিলে। না না না বৌদি। সে দেখে কাজ নেই। কোনো মহিলা ও-সব দেখে না।

মন্দা কলস্বরে হেসে উঠলো, আমি মহিলা নই গো ঠাকুর! মহিলা তো মানুষের তৈরি করা মেকি অপ্রকৃত আড়ষ্ট জীব, গালাগালি দিও না

আমায়। আমি খাঁটি মানুষ, জীবন যার বুকের ভেতর উদ্দাম হয়ে দিবারাত্রি ধ্বক ধ্বক করছে। জানো, আমি পুরাকালে জন্মালে পুরুষের ধনুকে জ্যা তুলে দিতুম, ধনুকে বাণ যোগাতুম তূণ নিঃশেষ করে। কোনো পূর্বজন্মে দিয়েছি কিনা কে জানে? এ-কালটা আমার ক্রিমিন্যল আইনের বই ঝাড়াঝুড়ি করেই কাটতো যদি না তুমি আমাকে শক্তি পৌরুষের সন্ধান, স্বাদ জানাতে। যাই বলো, আমি দেখবো কিন্তু।

বিকেলে মন্দা অশোকের ফুটবল খেলা দেখে তাকে নিজের বাড়ি টেনে নিয়ে এলো। সান্ধ্যসভা বসলো মাঠে। প্রমোদ আরাম-কেদারায় শয়ান হয়ে ডিক্যাণ্টর আর ফরসির মাঝে বিচরণ করতে লাগলো। লক্ষ্ণৌয়া মিঠে তামাকের সৌরভে স্থানটা ভরে উঠলো।

মন্দা কাপড় বদলে এসে বসলো, প্রশ্ন করলে, আচ্ছা অশোকবাবু, চক্ষুওয়ালার মতো আপনাদের হরদোইতে ফিনিক-ফোটা জোছনা ওঠে না কেন?

জবাব দিলে প্রমোদ, জোছনা ওঠে না বেশ করে। ইট ইজ নেকেড্ অ্যাণ্ড আন্‌অ্যাশেম্‌ড্। আই লাইক ডার্কনেস।

হ্যাঁ তা জানি। তোমাকে অন্ধকারেই মানায় কি না! সে যাকগে, আপনার ও শাদা-চামড়া গোরাগুলোকে ভয় করছিলো না? আমার করছিলো।

অশোক হাসলে, ভয় কেন করবে শুধু-শুধু। খেলাতে যদি ভয় থাকে সেটা উভয়পক্ষেই থাকে, তাতে শাদা-কালা বিভাগ নেই। আমার

খেলার ভিত্তি, আমি ধরে নি আমি প্রতিপক্ষের চেয়েও সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ, সেই আমাকে ভয় শ্রদ্ধার চোখে দেখছে। তাই আমার পথ বাধাশূন্য হয়ে যায়।

রাত্রি ন'টা পর্যন্ত সেদিন খেলার গল্প করে অশোক বাড়ি গেলো।



নয়

জয়ের ক্ষণে বিজয়ীর কাছে কার গুরুত্ব বেশি—বধূর না প্রিয়তমার? নিরবধি কাল প্রিয়তমার সম্পূর্ণ দাবীটা স্বীকার করে নিয়েছে। রামলাল ক্যাপ্‌ বিজয়ের বৃহৎ সোনার মেডেলটা পকেটে নিয়ে অশোক লক্ষ্ণৌ ত্যাগ করবার জন্য ছটফট করছিলো। বন্ধুরা যে তাকে সে-রাত্রের উৎসবে থেকে যাবার জন্য বৃথা অনুরোধ আর টানাটানি করছিলো তার বিশেষ কারণ ছিলো। জয়টা এক হিসাবে অশোকের জন্যই। সে নিজের কঠিন প্রয়াস ও সতর্কতায় দুর্ধর্ষ করোনেশন ক্লাবকে দুটি গোল দিয়ে খেলা শেষ হবার অনেক আগে জয় নিঃসন্দেহ করে দিয়েছিলো। অবশেষে অশোক বন্ধুদলের সকল অনুরোধ উপেক্ষা করে গাড়িতে উঠলো। হরদোই যখন পৌঁছলো তখন রাত্রি দশটা বেজে গেছে। সে স্টেশন থেকে সোজা ছুটল মন্দার কাছে। স্পষ্ট করে জানতো না মন্দা তার প্রিয়তমা কি না, কিন্তু তার অবচেতনা তাকে মন্দার কাছেই জোর করে নিয়ে গেলো।

ফটক বন্ধ। বর্ষা কালের গুমট রাত্রি। কামিনী গাছের তলায় মন্দা প্রমোদ শুয়েছিলো। অন্ধকারেও শাদা দুটো মশারি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো। ফটক থেকেই অশোক বেয়ারাকে ডাকলে। মন্দা জেগেছিলো, সাড়া দিলে, আসুন আসুন। তাড়াতাড়ি কাপড় ঠিক করে

নিয়ে জামা পরে সে উঠে এলো। ফটক খুলে দিয়ে বললে, তোমারই অপেক্ষা করছিলুম, জানতুম আজই আসবে তুমি।

হেরে এলুম বৌদি। গেলেন না তো আর! তাহলে জিততুম।

মিথ্যে বোলোনা। হারতে তুমি পারো না। আমি সমস্ত দিন তদ্গত মনে তোমার বিজয়কামনা করেছি যে!

অশোক হাসলো, হারিনি বৌদি। এই নিন। পকেট থেকে ছোটো একটা নকল চামড়ার কেস বার করে সে নীল রেশমের লম্বা ফিতে বাঁধা মেডেলটা মন্দার হাতে দিলে। মন্দা সেটা হাতে করে প্রমোদের খাটের কাছে গেলো। ওগো শুনছো, ওগো। অশোকবাবুর মেডেল দেখো, ওঠো। মশারির ভেতর হাত ঢুকিয়ে সে প্রমোদের গা নাড়া দিলে কিন্তু ঘুম ভাঙাতে পারলে না। তখন বারান্দায় উঠে মন্দা কমানো দেয়াল-বাতিটা উজ্জ্বল করে দিয়ে মেডেলটা উলটে-পালটে দেখলে। তারপর মালার মতো সেটা গলায় পরে অশোকের দিকে চেয়ে প্রীতির হাসি হাসলে। একটু পরে বললে, আর না, রাত হয়েছে বাড়ি যাও। কাল রাত্রে আমার কাছে খেও, বুঝেছো? চলো ফটক বন্ধ করে আসি। মন্দা খালি পায়ে ছিলো, খাটের কাছে গিয়ে চটি পরে এলো।

বকুল গাছের ছায়ায় ফটক। বিদায়ক্ষণের আপনি দাঁড়িয়ে যাবার নিয়মে সেখানে দুজনেই দাঁড়ালো। মন্দা জিগগেস করলে, ও অশোক, আমার জয় কামনার বকশিস কই?

খাইয়ে দেবো একদিন বৌদি।

খাওয়াবে? আচ্ছা। কিন্তু তোমার চেতনা জাগবে কবে? নাও, খুলে নাও তোমার মেডেল—নাওনা! তাও পারবে না? ভীতু!!

বকুল গাছটা ততক্ষণে যেন অশোকের মাথার ওপর ভেঙে পড়েছে। তার নিচের নিবিড় অন্ধকার অশোকের চোখের আলো দিয়েছে ছেয়ে। দূর থেকে মন্দার স্বর এলো, কাল খাবার কথা ভুলবেন না যেন!

মিনিকে ঘুম থেকে তুলে অশোক তার গলায় মেডেলটা পরিয়ে দিলে। মিনি আনন্দে ভরে উঠলো, কিন্তু সে অনুভব করতে পারলে না যে মেডেলের ধাতুটা তখনো অন্যের বুকের স্পর্শে উষ্ণ। প্রিয়তমার বিকীর্ণ করা তাপ সহজ শীতল বধূটি সে-রাত্রে অসন্দিগ্ধচিত্তে নিজের সৃষ্টি করা উত্তাপ বলে, নিজের উত্তেজিত করা আবেগ বলে গ্রহণ করলে।

একদা বিকেল বেলা লড়তে লড়তে ডনোহিউ আর অশোক আলিঙ্গন-বন্ধের মতো ক্লিঞ্চ করেছে। নিজের ডান বাহুর নিচে, অশোকের বাম বাহুটা চেপে ধরে সাহেবটা অবিরাম অশোকের বুকে পাঁজরায় ঘুঁষি বৃষ্টি করছিলো। অশোক কোনো রকমে ক্লিঞ্চ ভেঙে দ্রুতশ্বাস দমন করে আক্রমণ করলে। ডনোহিউ হঠাৎ বলে উঠলো, দেয়ার'স্ এ লেডি অন দি টেরেস লুকিং অ্যাট অস্।

লেট হার, বলে অশোক সবেগে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। সে সরে গিয়ে দু-বাহু ওপরে তুলে বললে, ডোন্‌ট্ বি সিলি, স্টপ্। উই আর অনকভবৃড।

অশোক হাসলে, বললে, ডোন্‌ট ইউ ওয়রি। শী ইজ নট্ ওয়ন টু

ফেণ্ট অ্যাওয়ে বাই লুকিং অ্যাট মেনস বেয়র বডিজ। শী হ্যাস কম টু সি এ ডেস্‌প্যারেট ফাইট। কম অ্যালং। ঘুঁষোঘুঁষি চললো ওদের প্রচণ্ড বেগে।

ব্যায়ামান্তে অশোক স্নান সেরে এসে দেখলে মিনি মন্দা কেউ নেই। মন্দা মিনিকে নিজের বাড়ি ধরে নিয়ে গেছে। সেও গেলো সেখানে। দুজনকে দেখে বললে, ও বৌদি, মিনিকে নিয়ে পালিয়েছেন, এন্‌টাইসিং-এর দায়ে ফেলি যদি ?

বাঁচি তাহলে। কিন্তু আমার শক্তি কি শুধু অবলাকেই এন্‌টাইস করবার ? বড়ো কিছু পারি না ? বল্‌ না মিনি। মন্দার চোখ ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে উঠতো, তখনো উঠলো। কিন্তু ও কথা থাক। আপনার সাহেবটির নাক অমন চ্যাপ্টা থাঁদা কেন ? মাগো, কী বীভৎস !

অশোক মন্দার মুখভঙ্গী দেখে হেসে উঠলো, বললে, আমার নাকটিকেও থাঁদা করে দেবার বিষয়ে ওর যথেষ্ট যত্ন আছে। কেবল মিনির মত নেই বলে আমি থাঁদা হইনি। যারা সত্যিকার ঘুঁষো লড়িয়ে তারা বলে নাকটা একটা বৃথা অলঙ্কার। নিশ্বাস নেবার জন্য দুটো ফুটো বজায় রেখে মুখটা সমতল করে নেওয়াই সুবিধা।

আচ্ছা, আমাকে যদি ওই রকম করে একটা ঘুঁষো মারেন, বাঁচি ?

অশোক মুখে চুকচুক শব্দ করে উত্তর দিলে, আহাহা, মনে করতেও বুক ফেটে যায় বৌদি। তার আগে যেন আমার হাত দুটো খসে যায়, আমি কবন্ধ হয়ে থাকি। ও ঘুঁষো যে খায় আর খাওয়ায় সেই কেবল ওর মর্ম জানে বৌদি !

ও মিনি, আয় অশোকবাবুর গায়ের জোর পরীক্ষা করি। আমাদের দুজনকে বিপক্ষ করে দড়ি টানবেন অশোকবাবু?

আলবত টানবো।

অশোক হো হো করে হেসে উঠলো যখন মন্দা সত্যই ইঁদারা থেকে জল তোলবার একগাছা মোটা কাছি নিয়ে এলো।

মিনি মন্দার তাড়ায় দড়ি ধরলে। মন্দা তাকে বললে, টান পোড়ারমুখি, সজোরে টান। পতিদেবতা বলে রেয়াৎ করিসনে। এই টানাটানিই জগতের সারবস্তু। চন্দ্র টানে বারিধিকে, প্রকৃতি টানে পুরুষকে, আলো টানে পতঙ্গকে—!

দড়ির অন্য প্রান্তটা হাতে করে অশোক আবার উচ্চকণ্ঠে হাসলো, বললে, বাহবা বৌদি, এমন দার্শনিক ট্যগ অব ওয়র ভূ-ভারতে আর কেউ করেনি।

টানাটানির মধ্যে প্রমোদ এলো। মিনি ঘোমটা টেনে বারান্দায় পালালো। মন্দা বললে, ওগো, এসো একবার। দেখি তোমায় দড়ি দিয়ে টানতে পারি কিনা! আর তো কিছু দিয়ে পারলুম না! প্রমোদও সহর্ষে টানাটানিতে যোগ দিলে। সন্ধ্যা নামতে ওদের খেলা থামলো।

পরদিন বিকেলে অশোক তার খলিফার সঙ্গে কুস্তিতে রত ছিলো। সে জানতোও না যে মন্দা এসেছে এবং বারান্দা থেকে মধুমালতী লতার ফাঁক দিয়ে তাকে লক্ষ্য করছে। মন্দা অশোকের দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিলো আর ভাবছিলো, কবাটবক্ষ আর স্তম্ভের মতো উরুর সমন্বয় না দেখলে পুরুষকে দেখা বৃথা। মন্দা শিউরে উঠলো ভেবে, সুঠাম দেহোদ্ভূত

চাপে না জানি কতো বিস্ময়, কতো রোমাঞ্চ! ঠিক সেই সময়ে মিনি ভেতর থেকে এসে তার কাছে দাঁড়ালো, আশ্চর্য হয়ে জিগগেস করলে, ওকি মন্দাদি, তোমার হাত দুটোয় অমন কাঁটা দিয়েছে কেন ভাই ?

মিনি মন্দাকে পৌঁছতে গিয়েছিলো। ফেরবার সময়ে অশোকও উঠলো। মন্দা তার দিকে চেয়ে চোখ পাকিয়ে বললে, বসুন আপনি, বউটির আঁচল ধরে এখনি বাড়ি যেতে হবে না। আর, গিয়ে করবেনই বা কি ? ওতো এখন শাশুড়ীর এলাকায় থাকবে। দূর থেকে দেখে হা-হুতাশ করতে মিষ্টি লাগে বুঝি ?

সে মিনিকে গাড়িতে তুলে দিয়ে এসে বসলো। অশোককে বললে, কাল থেকে তোমাকে কিন্তু টেনিসে আসতে হবে বলে রাখছি। আমি মনে করিয়ে দেবো।

পরদিন বেলা দুটোর সময় বেয়ারা মন্দার চিঠি নিয়ে এলো, ও অশোক, সকাল-সকাল এসো। সিঙ্গল্‌সে তোমাকে বিপর্যস্ত করবো, তারপর ডবল্‌সে তোমার ঘরকরনা করবো, কেমন ?

যেমন মন্দাকিনীর খরগতি তার নাড়ীতে তেমনি খেলার উন্মাদনা ছিলো তার রক্তে। মন্দা সত্যিই খেলাটা আয়ত্ত করেছিলো, অসম্ভব উন্নতি করেছিলো সযত্ন চেষ্টায়। সিঙ্গল্‌সে তার চতুর বিপক্ষতায় অশোক খুশি হোলো, আরো খুশি হোলো ইচ্ছা করে হেরে। সিঙ্গল্‌স্ শেষ করে মন্দা নেটের ওধারে দাঁড়িয়ে রক্তোচ্ছ্বসিত মুখে মধুর হেসে বললে, স্বীকার করো, বলো, বলীকে কৌশলীকে হয়রান করেছি কিনা ? শুধু পয়েণ্টস্ আর সেটের হার নয়, অন্তরের হার মানো।

বাড়ির পাশেই ক্লাব। ডবল্‌স্‌ অবসানে প্রমোদ বিলিয়র্ডস্‌ খেলবার জন্য রয়ে গেলো। ওরা দুজনে রাস্তা ঘুরে বাড়ি ফিরছিলো, অশোক শুনলে, মন্দা অত্যন্ত মৃদুস্বরে গুন্‌গুন্‌ করছে, "সুধায়, সুধায় ভরা। এই যে কালো মাটির বাসা শ্যামল সুখের ধরা।"



দশ

ওদের টেনিসের ঘরকরনা আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অশোকের মনের তুলাদণ্ডের একটা পাল্লা স্পষ্টভাবে মন্দার দিকে ঝুঁকে পড়লো। মিনি লক্ষ্য করলে অশোকের সত্তা ভিন্ন হয়ে গেছে। সে মন্দার কথাই বলে, মন্দার ভাবেই ভাবান্বিত, রবিবার ছাড়াও প্রমোদের ছুটিছাটার দিনগুলো মন্দার বাড়িতেই কাটায়, উদ্দীপনাও নিয়ে আসে মন্দার কাছ থেকে।

মিনি বেদনা বোধ করলে, কিন্তু মন তার অভিমানে উপছে উঠলো না, মনে হিংসাবোধও এলোনা। একবার তার মনে হয়েছিলো, একটা বোঝাপড়া করে নেয়, অশোককে বলে, আমাকে তুমি ভুলছো কেন? পরক্ষণেই তার মন বললে, না ছিঃ। উপযাচিকা হবো, ভালোবাসার ভাগাভাগি নিয়ে অশান্তি ডেকে আনবো? মন্দার অশোকের সঙ্গে আচরণের সবটুকু সে জানতো না, অশোকও আর বোলতো না সব কিছু। সে অনেক তুচ্ছ ও রসালো খুঁটিনাটি নিজের মনে পুঁজি করতে আরম্ভ করেছিলো নিজের সংবেদটিকে সুতীক্ষ্ণ করে। কিন্তু মিনি চতুর মেয়ে, মোটামুটি বুঝতো বহ্নির আকর্ষণে পতঙ্গ মেতেছে, তার ডানা পুড়বে। পুড়বে কেন—পুড়ে গেছে। দীপের সান্নিধ্য ছাড়িয়ে তার আর পালাবার উপায় নেই। দীপশিখাই তার প্রাণ, শিখাটাই তার ইহকালের-পরকালের গতি।

মিনি প্রত্যহ মন্দার কাছে যাওয়া-আসা আরম্ভ করলে, যদিও মন্দাও নিত্য ওদের বাড়ি আসতো। কিন্তু মিনি মন্দাকে তার নিজের আবেষ্টনেই দেখতে চাইতো, যাতে অশোক তাকে প্রতিক্ষণ দেখে। সে বাইরে যাবার সাজগোজে সামাজিক সংযমের ভেতর মন্দাকে দেখতে চাইতো না। অশোক নিত্য সহজ মন্দাকেই দেখতো, সজ্জিত সংযত আবরণের মুখোস-পরা অন্য মন্দাকে দেখতোনা। এ-কথা মিনি মনে টুকে রেখেছিলো। সে জানতো ওদের দুজনের প্রতিযোগিতা সহজের কঠিন ক্ষেত্রে—যেথায় আটপৌরে বেশ, কথাবার্তা ঘরোয়া, যেখানে সাধ করে সজ্জা নয়, সাজানো কথা নেই—যাতে ব্যাধভীতি হতে পারে ভীরু শীকারের।

মিনি আজকাল মুখরা হয়েছে। অশোক তাকে আদর করে পারবতীয়া বলে ডাকতো বটে কিন্তু সত্যই কিছু মিনির পাহাড়ী মেয়েদের মতো ভাষার দৈন্য ছিলোনা। ভাষার দরকার তার এতকাল হয়নি, কারণ অশোক নিজের আবেগেই পূর্ণ হয়ে থাকতো, মিনির অপেক্ষা করতো না—না ভাষার, না প্রতিদানের। মিনির সুখের ইয়ত্তা ছিলোনা।

অশোক সেদিন ভোরের গাড়িতে লক্ষ্ণৌ গেছে, রাত্রে ফেরার কথা। কাছারি থেকে শ্বশুরের গাড়ি ফিরে এলে খেয়ে-দেয়ে মিনি মন্দার কাছে গেলো। মন্দা টানা পাখার নিচে শুয়ে কোন এক নবকুমার শর্মার নবপ্রকাশিত কাব্য পড়ছিলো, সেটা নাকি সত্যেন দত্তের বেনামী রচনা। মিনিকে দেখে মন্দা খাট থেকে না উঠেই দুই বাহু বাড়িয়ে দিয়ে বললে, আয় মিনি। কিন্তু আগে ওই বাটা থেকে পান নিয়ে নিজে খা আর

একটা আমার মুখে দে ভাই। আলিঙ্গনে মিনিকে আবদ্ধ করে তার মুখমণ্ডল চুম্বনে চুম্বনে প্লাবিত করে দিয়ে মন্দা বললে, তোকে অশোকের মতো করে আদর করি আয়, আজ তো সে নেই। মিলিয়ে দেখ ঠিক হচ্চে কিনা।

আচ্ছা, মন্দাদি, আমাকে এতো চুমো খাও কেন ভাই? তোমার লাভ কি?

খিলখিল করে হেসে মন্দা বললে, অধরসুধা আমার পথ্য কিনা! এই দেখ নবকুমার শর্মা লিখেছে—'মোদের অধরসুধাই পথ্য যখন সুধা জোটেই না।' তোর আপত্তি কিসের পোড়ারমুখি, তোর মুখটাই তো কেবল চুমু খাবার জন্য হয়েছে। সব মুখই তো ডাল-ভাত খাওয়ার ছাপ মারা, চুমু খাওয়া মুখ মেলে লাখে একটা। খাই তো তোর ক্ষতি কি? নবকুমার শর্মা আরো বলছে :—

'কেউ জানবে না ও লাজের ডালি,
তুই কি খেলি আর কি খাওয়ালি।
চুরি করে চুমু খেলে ভাই
হেঁচকি ওঠে না, হেঁচকি ওঠেই না।'

মন্দা হাসলো ঘর কাঁপিয়ে। মিনিও হাসলো এই রঙ্গিলার লীলায়, অনবদ্য রসিকতায়। মন্দা বললে, ভারি ভালো লাগে ভাই। তোকে দেখলে মনে হয়, আমি তোর গোপন-লাভার, নই? আমার লাভ?

আছে কি নেই জানিনে; হয়তো আছে কিছু। যদি বলি এক পাত্রে জল খাওয়ার সুখ, বুঝতে পারবি? বলুনা, বুঝতে পারবি?

তোমার জাত গিয়েছে মন্দাদি!

গেছে? যাকগে জাত! কেন গেছে জানিস?

এসেছে মোর-জাত-খোয়ানো প্রিয়
ভদ্র-নিয়ম ভাঙা।
তাকে দেখে পথ গিয়েছি ভুলে—
কোথায় বামুনডাঙা।

হারালে ভাই। এইখানেই আমার হার। তোমাতে আমাতে তফাৎ কি মন্দাদি? দুজনেই তো আমরা মেয়ে?

মন্দা হাসলো। মিনির কপালের একগোছা চুল সরিয়ে দিয়ে বললে, সত্যি বলবো তোকে? তফাৎ? তুই দেহ, আমি বাণী। তুই দীপাধার, আমি শিখা। রক্তমাংসে তোর ছোট্ট এতোটুকু সীমানা, বাণী পরিব্যাপ্ত, সীমানা নেই তার ব্যাপ্তির। ব্যাপ্তি তার আলোয় সুরে বর্ণে গন্ধে, বুঝলি?

আমাকে দাওনা ভাই তোমার বাণী! কিন্তু রক্তমাংসেও তো তুমি কম নও!

তোর কাছে? কিন্তু বাণী যে স্ব-রূপ, তা কি মন থেকে ছিঁড়ে অপরকে দেওয়া যায়? যায়না। দেহটাকে যখন ইচ্ছা দান করা যায়, বাণী দান করা যায়না। পারলে দিতুম তোকে উজাড় করে, আমি সানন্দে বোবা

হয়ে থাকতুম। দেওয়ালের দিকে ক্ষণিক নীরবে চেয়ে থেকে মন্দা আবার বললে, সেই বোধ হয় ভালো হোতো।

আমাকে শিখিয়ে দাও না ভাই। আমার মধ্যেও তো সকল সম্ভাবনা থাকতে পারে। আমি কি শুধু হারবো ?

কিসের হার ? কার কাছে হার ? মন্দা গম্ভীর হয়ে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে মিনির মুখের দিকে চেয়ে রইলো। ও মিনি, তোর গাল অমন টুকটুকে হয়ে উঠলো কেন ? বলনা ভাই, কিসের হার ? কোথায় হার ?

না, এমনি বললুম দিদি।

তা হলে বলি তোকে। ধর—যদি কখনো আর কাউকে ভালোবাসি, পাওয়ার চেয়ে না-পাওয়ার, কামনার সুখ-বেদনাটুকুই যদি ছাপানো হয়, দুঃখ থাকবে না যদি আমার আকুতি পৌঁছে যায় যথাস্থানে। মন্দা আর স্পষ্ট কথার ধার দিয়ে গেলো না, কথাটাকে ঘুলিয়ে দিয়ে বললে, গঙ্গার ধারে দেখেছিস তো, মেয়েরা পূজা করে জলে ফুলগুলো ফেলে দেয়! ফুল উচ্ছিষ্ট হয় সহজে। সে-ফুল যায় কচ্ছপের পেটে, কিছু যায় স্রোতে ভেসে। কিন্তু তার সৌরভে মেশানো প্রার্থনা কাকুতি তন্ময়তা বুঝিবা আরাধ্যের কাছে গিয়ে পৌঁছয়। তুই কেবল ফুলগুলো কুড়োস নাকি মিনি ? মন্দার চোখ জ্বলে উঠলো, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হোলো।

মিনি উত্তর দিলে, এক বর্ণও বুঝলুম না মন্দাদি।

বুঝবিনে তা জানি। আমার ও-কথার কোনো মানে নেই কিনা ?

মিনি মনে মনে বললে, মানে নেই আবার! বুঝেছি তোমায় ঠাকরুণ, খুব বুঝেছি। আচ্ছা মন্দাদি, সেদিন দড়ি টানলুম আমরা। ও-দড়ি টানার

জয় কি শক্তি দিয়ে, না, ভার দিয়ে? উনি তো বলেন, সবটাই ভারের ব্যাপার শেষ পর্যন্ত।

রাক্কুসি, এবার আমি হার মানলুম। মন্দা সজোরে মিনির গাল টিপে দিলে। কি বলছিস তুই, আমি বুঝলুম না কেন?

মিনি খুশি হয়ে হেসে উঠলো, তোমাকে বলি ভাই, আমি সামান্য। আমার সব কিছুতেই ওই ভারের ভরসা, ভাগ্যের জোরে কেন্দ্র অধিকার করে বসে আছি কিনা! তোমার দড়ি টানা গলায় ফাঁসি পরিয়ে দেওয়া, আমার দড়ি-টানা সহায় দেওয়া। বুঝেছো ভাই?

মন্দা আশ্চর্য হয়ে দেখলে শান্তশিষ্ট মিনির চোখও জ্বলে উঠেছে। সে-জ্বলন্ত চোখে আরো যেন চলচ্চিত্রের ছবি দেখতে পেলে, ডনোহিউ-এর প্রচণ্ড একটা ঘুঁষি তার মুখে এসে পড়লো। মিনির কপালে সে চুমো দিয়ে বললে, মিনি ভাই, নিশ্চয়ই তোর মন খারাপ হয়েছে, আবোল-তাবোল ভাবছিস। ওঠ, চুল বেঁধে দি তোর! অশোক বাড়ি এসে তোকে দেখে পাগল হয়ে যাবে।

শিঙার কামরার মেঝেয় ওরা চুল বাঁধতে বসলো। মন্দা মিনির একরাশ চুল খুলে দিলে। আকাশ মন সে মেঘবরণ এলানো চুলে ছেয়ে গেলো, বিজলী হানলো, গর্জন ছুটলো, বৃষ্টি নামলো ধরণী অন্ধকার করে। উত্তরা নক্ষত্রের প্রবল বর্ষণ তাদের আকর্ষণ করে বাইরের বারান্দায় নিয়ে গেলো। বারিধারা দেখতে দেখতে মন্দা বললে, মিনি, গান শুনবি?

মিনি উৎসাহিত হয়ে বললে, হ্যাঁ, ভাই। চলো বাজনার কাছে চলো।

বাজনা নয়, এমনি গান। প্রকৃতি মৃদঙ্গ বাজাচ্ছে। থামে ঠেস দিয়ে মন্দা গাইলো :

সখি নিয়ে যা রাধার বিরহের ভার
কতো আর ঢেকে রাখি বল।
আর পারিস যদি তো আনিস হরিয়ে
এক ফোঁটা তার আঁখি জল।

কথাগুলির মাধুর্যে, ম্রিয়মান সুরের ক্লান্তি বেদনায় মিনির মন করুণায় ভরে উঠলো। ইতিপূর্বে সে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলো, সে ভাবটা তার মন থেকে তিরোহিত হোলো। মিনি মনে মনে বললে, আহা!

চুল বাঁধা শেষ হোলো।

না না, ভাই না না। তোমার কাপড়-জামা অনেক পরেছি। তা বলে এ-সব পরতে পারবো না।

পরতে তোকে হবে। আমার সাধ।

না ভাই, দয়া করো। শ্বাশুড়ীর সঙ্গে দেখা হবে। শ্বশুরের খাওয়ার কাছে বসতে হবে। তোমার মতো আমি একা নই তো!

তা হলে নিয়ে যা সঙ্গে করে, কাজ চুকিয়ে পরিস। বল পরবি? মিনি দেখলে মন্দার চোখে যেন আকুল অনুনয়।

পরবো? আচ্ছা পরবো। কিন্তু ··· কিন্তু ভারি বেহায়া বলে মনে হবে নিজেকে।

পোড়ারমুখি, আমায় বেহায়া বলতে চাস? অশোকও দেখেছে আমাকে ও-কাপড় পরে।

মিনি মন্দার বুকে হাত রেখে বললে, রাগ করবে না বলো? বাঘের ডোরা কি গরুর গায়ে মানায় ভাই?

ওমা, তুই তো কম নস মিনি! আমি জানতুম তোর মনে প্যাঁচ নেই। অবাক করলি। কিন্তু বল, কথা রাখবি?

আচ্ছা রাখবো।

রাত্রে সুপরিচিত পদশব্দে মিনি বুঝলে অশোক খাওয়া-দাওয়া সেরে আসছে। কৌতুকভরে সে আলোটা খুব কমিয়ে দিয়ে খাটের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো। অশোক পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকেই চমকে উঠলো, বৌদি, আপনি?

এ সম্বোধনে মিনির মাথায় বজ্রাঘাত হোলো। সে তাড়াতাড়ি দু'পা আগিয়ে গিয়ে আলোটা উজ্জ্বল করে দিলে। চেয়ে দেখলে অশোকের মুখ বিস্ময়ান্বিত, সে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে যার দিকে তার প্রায় সবটাই মন্দা। বেশে মন্দা, কেশবিন্যাসে মন্দা সম্পূর্ণ। সে-প্রসাধন মিনির মুখে দেহে মন্দারই ছায়াপাত করেছে।

ও তুমি? অশোকের বুকে বিস্ময়ের ক্রিয়া তখনো থামেনি। তবুও সে কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব সহজ করে বললে, ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছিলে মিন্টি! অশোক আলিঙ্গন-পিয়াসী দুই বাহু প্রসারিত করলে।

দাঁড়াও, আসছি। অশোককে ছুঁতে না দিয়ে মিনি চকিতে পাশ কাটিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। ফিরলো যখন তখন তার খোলা চুল যা-তা করে

জড়ানো, সামান্য শাদা কাপড় দেহে। অধোবাসের পরিবর্তনও পরিস্ফুট। চোখের জল সন্থবিধৌত। মিনি জোর করে মৃদু হেসে বললে, কাপড়গুলো পাট ভেঙে ময়লা হয়ে যেতো, তাই খুলে এলুম।

ক্ষণিক পরে মিনির মনে তার অজ্ঞাতসারে আপত্তি জেগে উঠলো। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো, ওগো, বড়ো মাথা ধরেছে, আজ ছুটি দাও। এই তার প্রথম ছুটি চাওয়া।

কিন্তু সেই কি ছুটির ক্ষণ? স্বামীর নিবিড় আলিঙ্গনের ভেতর থেকেও এ-প্রিয়ার অস্তিত্ব ডুবলো, জাগলো প্রাত্যহিকতার শাদামাটা বধূ। আর জাগলো—অন্য প্রিয়া; পৃথিবীর প্রথম বয়স থেকে পুরুষ যে দয়িতাকে দৃঢ়ালিঙ্গিত ঘরণীকে প্রতীক করে খুঁজেছে পেয়েছে, খুঁজবে পাবে। নিজের প্রত্যেকটি অঙ্গ দিয়ে মিনি সে-কথা বুঝলো। তার রোমকূপে রোমকূপে ভরে উঠলো এই পরম পরাজয়ের নিবিড় গ্লানি।

অশোক ঘুমিয়ে পড়লো। মিনি চুপি চুপি বারান্দায় উঠে গেলো। রজনীগন্ধার সৌরভকে বিফল করে সেই তার জীবনে প্রথম বুকফাটা কান্না। মন্দাকে সে অভিসম্পাত করলে। তার স্বামী-হরণের কথায় শিউরে উঠে দাঁতে দাঁত ঘসে বললে, সহ্য করবো না, এ সহ্য করবো না আমি।

মিনির এ নূতন উপলব্ধিটুকু ভীষণ। অনেকক্ষণ পরে আত্মসম্বরণ করে সে শুতে গেলো কিন্তু ঘুমোতে পারলে না! মনে অপার এলোমেলো চিন্তা ভীড় করে এলো। সেখানে আক্রোশ ভয় আর হতাশার দ্বন্দ্ব চলতে লাগলো অবিরাম। মিনি জানতেও পারলে না যে ভয়টাই অবশেষে

তার মনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। সকালে ওঠবার অনেক আগে সে উঠে গেলো, চোখের নিচে গভীর কালি, মুখ বিশীর্ণ পাণ্ডুর। মিনির অটুট স্বাস্থ্য; মনে নিবিড় শান্তি ছিলো, দেহে ছিলো শান্তির অপরাভূত চমৎকার শ্রী। শাশুড়ী তাকে দেখে চমকে উঠে বললেন, এ-কি, অসুখ করেছে নাকি বৌমা? কি চেহারা হয়েছে তোমার? যেন ঝড়ে মুচড়ে দেওয়া গাছ!

না মা, অসুখ করবে কেন! গরমে রাতে ঘুম হয়নি একটুও। সে তাড়াতাড়ি তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে স্নানের ঘরে ঢুকে পড়লো। শাশুড়ী আরো বিস্মিত হলেন; রাত্রে জল হয়েছিলো খুব, গায়ে চাদর দিতে হয়েছিলো তাঁকে।



এগারো

আশ্চর্য মানুষের মন আর মনশাসিত দেহের জোয়ার-ভাঁটা। এতোদিন মিনি যে-পথে বিচরণ করতো সে-পথটা ছিলো সোজা আর সদর্থক, ীর বিপ্লবে মিনির মন আপনি সে-পথ ত্যাগ করলে, ধরলে যেটা সেটা সংঘাতের উল্‌টো পথ। তার দেহের ক্রিয়ার ঐক্য গেলো, এলো শান্তিহীনতার শ্রান্তিকর একঘেয়ে ম্যাজম্যাজানি। শাশুড়ী তার হতশ্রী দেখে শঙ্কিত হলেন। তার সন্তান সম্ভাবনা কল্পনা করলেন, সেটা ভুল হোলো। ডাক্তার এলো, কিন্তু মনে যার ঘুণ ধরেছে দেহের চিকিৎসক তার কি করবে! চিকিৎসক বুঝুক আর না বুঝুক পরাজয় স্বীকার করা তাদের শাস্ত্রে লেখা নেই। টনিক লিখে খাওয়াদাওয়া তদারক করবার তাগিদ দিয়ে ডাক্তার চলে গেলো। মিনির আক্রমণক স্বভাব হলে হয়তো তার প্রকাশ ভিন্ন হতো, দেহে ঘা লাগতো না। অশোক মিনির পরিবর্তনটা সহজ ভাবেই নিলে, শুধু বুঝলে তার শরীর ভালো নয়। বোধ করি নিজের অসীম স্বাস্থ্য ও শক্তির অহঙ্কারে মিনিকে একদিন আদর করে প্রাজ্ঞের মতো বললে, মিন্টি, শরীর যে আসলে ব্যাধিমন্দির তাই বুঝি প্রমাণ করছো? রোগের তালিকায় এই 'ভালো লাগে না' রোগটাই মারাত্মক, কিন্তু গায়ের জোরে ওটাকে ঝেড়ে ফেলা

যায়। মিনি ক্ষুণ্ণ হোলো স্বামীর আসক্তিশূন্য নিরস বাহ্যিকতা কল্পনা করে। মুখে কিছু বললে না, শুধু মৃদু হাসলে।

সে যখন স্বামীর প্রতি বিমুখ হোলো অশোকের তখন নেশার মুখ। তার প্রতি অশোকের যত্ন চুকে গিয়েছিলো এমন নয় কিন্তু মিনি যতো দূরে সরে যেতে লাগলো অশোক ততই মন্দার দিকে ঝুঁকলো। আকর্ষণ শক্তি পেলে, গতি পেলে বিকর্ষণের কাছ থেকে। অশোকের দূরে থাকা মিনির মন্দ লাগত না, কিন্তু তার বিপদ হতো অশোক যখন আদরের ডালি নিয়ে তার কাছে আসতো। তার স্বতঃই মনে হতো সে প্রণয়াবেগ অপরের কাছ থেকে সঞ্চয় করে আনা। তার দেহ সঙ্কুচিত হতো, মন হতো বিরূপ; মুখ দিয়ে আপনিই বেরিয়ে যেতো, ওগো, আজ নয়, আজ মাফ করো, শরীর মোটে ভালো নেই। নিজের আবেগ তন্ময়তায় অশোক যদি সে-নিষেধ অগ্রাহ্য করতো সহজেই বুঝতে পারতো সে-মিনি মিনি নয়, যেন দারুময় আর কেউ। আগে এ-ডাকাতির, হঠাৎ লুঠ করে নেওয়ার বিপুল আনন্দ ছিলো উভয়ের কাছে। সে-আনন্দ উভয়ের দেহকোষ ছাড়িয়ে, অনুভূতিকে সুখের অতলে ডুবিয়ে দিয়ে আত্মায় ব্যাপ্ত হতো। লুণ্ঠণকারী যেমন পাগল হয়ে যেতো, লুণ্ঠিতাও তেমনি আনন্দে আবেগে পরম তৃপ্তিতে ভিন্ন আলোর রাজ্যে উধাও হয়ে যেতো আপনাকে লুঠিয়ে দিয়ে। এখন সময়ে-সময়ে বিবেক মিনিকে দংশন করতো, সে ভাবতো—এ করছি কি? বাধা দেওয়া যে আমার মনের স্বরূপ হয়ে গেলো! বিবেকের তাড়না অত্যুগ্র হয়ে উঠলে

এক আধ দিন সে নিজেই ধরা দিতো। কিন্তু তার দেহ-মনের প্রত্যন্ত দেশগুলি গোটানো সঙ্কুচিত, মিনি যে দারুময় তাই থেকে যেতো।

মন্দা তখন নিত্য আসতো। মিনি দেখতো তার উপছে-পড়া আনন্দ, দেখতো তার বর্ধমান অনবদ্য শ্রী, যেন তার নিজের শ্রীটুকুও মন্দা নিঙড়ে নিয়ে আপনাতে যোগ করে দিয়েছে। মিনি যতো শুষ্ক স্বল্পবাক হতে লাগলো মন্দা তেমনি রূপসী লীলাময়ী বাক্‌চতুরা হয়ে উঠলো। অশোককে দেখেও মিনির মনে হতো নূতন কোনো রাজা যেন বিজিত রাজ্যের দখল নিয়ে নিজের খেয়ালে মনোমত করে সেটাকে গড়ে তুলতে লেগে গেছে।

সর্বনেশে ওই বৈকালিক টেনিস—ডবল্‌সের ঘরকরনা! সুধায় ভরে ওঠার গানের কলিটা অশোক নিজের হৃদয়ে কুঁদে নিয়েছিলো। মন্দা একা সুধা পান করেনি, এক-চুমুকের সে-সুধার ভাগ অশোককেও পাত্র পরিপূর্ণ করে দিয়েছিলো। অশোক ভাবতো, কী অনির্বচনীয় কথাগুলো, কী শিহরণভরা তার উপলব্ধি! কাব্য রসাশ্রিত বাক্যের মুকুটমনি যে কেন তা সে হৃদয়ঙ্গম করেছিলো। ডনোহিউ সপ্তাহে দুবার আসতো, অশোক তাকে চা খাইয়ে তাড়াতাড়ি বিদায় দিতো। খলিফা মাইনে-করা লোক, তাকে রোজ ফিরিয়ে দিতে তার বিবেকে বাধতো না। আকাশচারী তার মন, দেহচর্চায় আর নামতে চাইতো না।

বাড়িতে মিনির ছবি ভরা। সে-সব ছবি তুলেছিলো অশোক। একদিন তার ফটোগ্রাফীর অদম্য শখ ছিলো, মিনি তখন নববধূর

সলাজ গণ্ডীটা পার হয়ে প্রথম-প্রিয়ার নব উন্মেষের রাজ্যে পদার্পণ করেছে। অশোক কি একটা বই খুঁজতে আলমারি ঘাঁটছিলো, বইয়ের কাতারের পেছনে ক্যামেরার বাক্স দুটোয় নজর পড়ল। সূক্ষ্ম ধুলো জমেছে তার ওপর। একটা ষ্টুডিয়ো-ক্যামেরা, অন্যটা কোড্যাক। সে ক্যামেরা দুটো বার করে ঝাড়পোঁছ করলে। আনমনে তোলা-ছবির প্লেট-ফিল্মের বাক্সগুলোও বার করে সেগুলো দেখতে লাগলো—মিনি, মিনি, মিনি, মিনি—কেবলই মিনি। তার নানা রূপ, নানা প্রসাধন—অপ্রসাধনেরও নানা সহজ রূপ। একটা বাক্সের তলার প্লেটটা তুলে অশোক চমকে উঠলো—মিনি সম্পূর্ণ বিবসনা। শরীরসাধকের চিরন্তন গ্রীকমনের পরিচয় সেটা। সেদিনকার নিভৃত ছাতে ছবিতোলার সব খুঁটিনাটি কথা তার মনে পড়ে গেলো।

ক্যামেরা দুটো সে পরীক্ষা করে দেখলে ঠিকই আছে। তৎক্ষণাৎ বাজারে গিয়ে সব উপকরণ সংগ্রহ করে নিয়ে এলো। ঘরসংলগ্ন বাথরুমটাকে ডার্করুমের উপযুক্ত করে নিলে। মিনি অসুস্থ হলেও গৃহকর্মে তার বিরতি ছিলো না, তাকে আবিষ্কার করলে ভাঁড়ার ঘরে। ডাকলে, মিণ্টি, শোন! কিন্তু কিছু না বলে তার হাত ধরে ঘরে নিয়ে এলো। বিছানার ওপর বড়ো ক্যামেরাটা খোলা। বললে, এসো মিনা, একটা ছবি তুলি তোমার, অনেককাল তুলিনি। কিন্তু ছবি তোলাতেও আর সে-মিনি নেই। সে উত্তর দিলে, না গো, ঢের তো তুলেছো, আর থাক এখন!

মুখের কথার চেয়ে বড়ো নিষেধ মিনির চোখে। অশোক সে-চোখ

দেখে আর কিছু বললে না। মিনিও ঘর ছেড়ে চলে গেলো। ক্যামেরা তৈরি। অশোক সেটা নিয়ে মন্দার বাড়ি গেলো। প্রমোদ তখন কাছারি যাবার জন্য প্রস্তুত, জিগগেস করলে, ওটা কি হে হাতে?

অশোক বললে, এঃ, ভেবেছিলুম আপনার ছবি তুলবো, হোলো না। আচ্ছা, কাল হবে, কাল তো রবিবার!

মন্দা কোথায় ছিলো। প্রমোদ ডাকলে, মন্দা, মন্দা! সে এলো। প্রমোদ বললে, আজ তোমাকে বাঘের চেয়েও শক্ত পাল্লায় ফেলে গেলুম। অ্যান অ্যামেচর ফটোগ্রাফার ইজ দি মোস্ট ডেনজরস বিস্‌ট ইন ক্রিয়েশন! অশোক ছবি তুলতে এসেছে। তুমি মারা যাবে। যাও, তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু বেঁচে থেকো, বিকেলে এসে যেন তোমাকে দেখতে পাই।

এ আপনার ভারি অন্যায়, প্রমোদদা! অশোক হাসলো।

আই অ্যাম রাইট, অশোক। অ্যামেচর ফটোগ্রাফার—মন্দা কি যে বলে—আমার শিরসি মা লিখ, মা লিখ! সে বাইক চড়ে বেরিয়ে গেলো।

অশোক বারান্দার চৌকিতে বসেছিলো। মন্দা দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে, মাথা খোলা, তার বাঁ-হাতের দুটো আঙুল গলার হার নিয়ে অলস ক্রীড়ায় রত। অশোক ক্যামেরাটা ঠিক করলে। মোড়া ত্রিপদের পায়া তিনটে টেনে টেনে বড় করে কব্জা আটকে দিয়ে মন্দার দিকে মুখ তুলে দেখলে সে তখনো দাঁড়িয়ে আছে। ওকি বৌদি, দাঁড়িয়ে আছেন যে এখনো? এই বেশেই ছবি তোলাবেন নাকি? মন্দা দেখাচ্ছে না যদিও!

দেখছি তোমাকে। এ বিদ্রেটাও আছে দেখছি! হঠাৎ মুখে আঁচল চাপা দিয়ে সে খিলখিল করে হেসে উঠলো, বললে, পরের বৌ দেখার এটা চমৎকার ফন্দি, নয় অশোক? বলোনা, কতোগুলি পরস্ত্রী তোমার অধিকারে আছে? বলবে না?

আপাততঃ একটি বৌদি। যান, কাপড় বদলে আসুন। আমি জায়গা খুঁজি।

ওদিকে ছিলো একটা পাতাবাহারী ঘন অ্যাক্লিফার সুউচ্চ বেড়া। অশোক তার সামনে ক্যামেরা দাঁড় করালে। মন্দা ভেতর থেকে ডাক দিলে, ও অশোক, এখানে এসো। সে ভেতরে গিয়ে দেখলে খোলা আলমারির সামনে মন্দা দাঁড়িয়ে। বলো, কি কাপড় পরবো?

যা-ইচ্ছে পরুন না। আমার ছবির একটা পাকা গ্যারান্টি আছে বৌদি, ছবি যে উঠবেই এমন কথা নেই। যদি বা ওঠে আপনি যে তাতে নিজেকে চিনতে পারবেন এমন কথাও দিতে পারবো না, তা বলে রাখছি।

মন্দার হীরকোজ্জ্বল চোখ ঝিকমিকিয়ে উঠলো, বললে, ছবির আমার শখ নেই, কিন্তু তোলাবার সাধ আছে। যাও তুমি, একটা কাপড় ঠিক করে দেবারও শক্তি নেই তোমার!

সে যখন প্রস্তুত হয়ে এলো অশোক তখন মাথায় কালো কাপড় চাপা দিয়ে ফোকস্ ঠিক করছে। পদশব্দ শুনে বললে, ক্যামেরার সামনে আসুন বৌদি। গ্রাউণ্ড গ্লাসে মন্দার ছায়া পড়লো। ফোকস্ ঠিক হবার মুহূর্তে নিমেষের জন্য অশোকের হৃদস্পন্দন থেমে গেলো। প্রবল

প্রশ্বাসের বাষ্পে গ্রাউণ্ড গ্লাসটা ঘোলাটে হয়ে গেলো। মিনি সে-রাত্রে যে-কাপড় পরেছিলো, সেই বেহায়া কাপড় মন্দার অঙ্গে। স্বচ্ছ বস্ত্রের তলায় যত্র তত্র অধোবাসের সুচারু ভঙ্গুর ফরাসি লেস্ আকুল হয়ে উঠেছে।

ক্যামেরার ভেতর দিয়ে অশোক দেখলে মন্দা ঠোঁট চেপে হাসলো— ঝড়ের আগে বিজলীর তীক্ষ্ণ হাসির মতো। সে হাত উল্‌টে মুখ চাপা দিয়ে বললে, ও অশোক, বলো না, বলবো একটা কথা?

কি বলুন না!

তোমার দৃষ্টি কোথায় বুঝতে পারছিনে যে! তোমার সামনে আমার লজ্জা করে না, এখন প্রতি অঙ্গে লজ্জা করছে কেন? মন্দা বুকে কাপড় টেনে দিলে। গ্রাউণ্ড গ্লাস এবার শুধু বাষ্পাচ্ছাদিত হলো না, অশোকের কপাল-মোছা ঘামে সিক্ত হয়ে গেলো।

সাড়া দিচ্ছোনা কেন? সাধে বলি এমন খুঁটিয়ে দেখবার যন্ত্র আর নেই! ঠিক বলিনি? মন্দা খিলখিল করে হাসলো। একটা কবিতা মনে পড়লো, শুনবে?

যদি মরণ লভিতে চাও
এসো তবে ঝাঁপ দাও অগাধ জলে—

আবরণের ভেতর থেকে চিত্রকরের আর মাথা বার করবার সাহস হোলো না। কৌতুক থামিয়ে মন্দা বললে, তোমার মতলব কি বলো তো? এই রাত্রিবাসে আমাকে স্থির পাষাণ মূর্তি করে রাখবে নাকি?

অবশেষে অশোক ক্যামেরায় এক্সপোজর দিলে, কিন্তু বিপুল চিত্ত-

চাঞ্চল্যে আগে ডার্কস্লাইড পরাতে ভুলে গেলো। মন্দা সেটা লক্ষ্য করেছিলো, কিন্তু কিছু না বলে মুচকি হেসে ভেতরে চলে গেলো।

ক্যামেরা গোছগাছ করে নিয়ে বারান্দায় উঠে অশোক বললে, এইবার যাই বৌদি।

গেলেই হোলো! যাওয়া অতো সহজ নাকি? কাপড় বদলে মন্দা বাইরে এলো। বলো কি খাবে—চা না কফি?

কফি খেয়ে পান নিয়ে অশোক আবার বললে, এবার তা হলে উঠি, কি বলেন?

আমি তোমার মডেল হলে এতো পরিশ্রম করার জন্য পারিশ্রমিক পেতুমগো ঠাকুর! পারিশ্রমিক দিয়ে যাও। সকাল থেকে রসেটির 'ব্লেসেড ড্যামোজেল' পড়ছিলুম। তুমিই দিলে না শেষ করতে! আমাকে নিয়ে তো আর তুমি কবিতা লিখলে না! আমাকে পড়ে শোনাও। মন্দা চটি একটা বই এনে পাতা খুলে অশোককে দেখিয়ে চৌকির এক কিনারায় বসে বললে, পড়ো। অশোক পড়লে:

Eat thou and drink ; tomorrow thou
Shall die.
Surely the earth, that wise being
Very old,
Needs not our help. Then loose me,
Love and hold—

আর থাক বৌদি।

পড়ো বলছি! অশোক ইতস্তত করতে লাগলো। মন্দা তীক্ষ্ণস্বরে আবার বললে, পড়ো, ও অশোক, পড়ো না!

অশোকের গলা কেঁপে গেলো, তবু পড়লে:

Now kiss and think that there are really those,
My own high-bosomed beauty, who increase
Vain gold, vain love. and yet might
Choose our way ?—

পড়া সাঙ্গ করে অশোক মন্দার মুখের দিকে চাইলে। মন্দা তার দৃষ্টিতে কি দেখলো কে জানে, আজ প্রথম সে চোখ নিচু করলে আর সে নিচু করাটাই অন্য ব্যক্তিটির মর্ম বিদ্ধ করলে। অশোক আত্মসম্বরণ করে বললে, আপনি কতো পড়েন বৌদি! আমি ও-কবির নামই শুনিনি। পড়ি কি? পড়িনে। মন্দা চোখ তুলে চাইলে। শুনবে কি করি? কে জানে কিসের পিপাসা এ! কিন্তু অতৃপ্ত অসীম সে পিপাসা, গলা যেন আমার নিরন্তর শুকিয়ে আছে, তাই রসনিবেদন খুঁজি গানে কাব্যে। বোঝো? মাথা দুলিয়ে বললে, না, তুমি বোঝো না। তোমার মন পুষ্ট হয়নি।

যে সব কথার মানে হয়না আমার বুঝে কাজ নেই। এবার চললুম

যাবে? মিনি কেমন আছে? মন্দা দুর্বোধ্য হাসি হাসলে।

বর্ষাঋতু গেছে কবে কিন্তু তখনো কজরীর জের থামেনি। শরতকালের

প্রসন্ন দিনেও তখনো কজরী আবদ্ধ হয়ে আছে। পথের ধারে একস্থানে অশত্থগাছে দোলনার দোলা। পল্লী যুবতীরা দুলছে, দিয়েছে সুর দুলিয়ে। দুটি যুবতী দোলনার দুধারে দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে পালা করে হাঁটু মুড়ে মুড়ে ঝোঁক দিয়ে দিয়ে দিয়েছে নিজেদের ও সখিদের দুলিয়ে—প্রান্ত হতে প্রান্তে। রসিয়ার গান আবেগে দুলছে :

আজ রৈণ অঁধেরী বরণ বিজরী চমকেরি
মোরা জিয়া ঘবরায়ে রাজা ছোড় ন যইও।
ঘিরি শাওন কী বদরি মৈকো ছোড় ন যইও।

মন্দাও যেন অশোককে দুলিয়ে দিয়েছে মিনির দিকে। অশোকেরও রসিয়া শুনে হঠাৎ কবি অতুলপ্রসাদের বাংলা কজরী মনে পড়ে গেলো :

যুবতী দলে দলে
চলেছে গলে গলে
পড়িছে ঢলে ঢলে
এ ওর গায়।
ঝরিছে ঝরঝর
স্বনিছে স্বন স্বন
শ্রাবণ মাহ্।

কোথায় মিনি? খাওয়া সেরে অশোক মিনিকে খুঁজলে। বারান্দায় মিনি নেই, ঘরেও নেই। ছাতের এক কোণে একটা ছোট ঘর। সেখানে

গ্রীষ্ম কালের ব্যবহারের জন্য হাল্‌কা খাট বিছানা থাকতো। সেই ঘরটার দরজা ভেজানো। মিনি একটা নেওয়ারের খাটে ঘুমিয়ে রয়েছে। অশোকের সেদিন বোঝবার ক্ষমতা ছিলো না মিনি তাকে এড়াবার জন্যই নিজের ঘরে যায়নি। দরজা ভেজিয়ে তার পাশে শুয়ে পড়ে অশোক মৃদুস্বরে ডাকলে, মিন্টি। সাড়া পাবার আগেই তার গালে চুমো দিয়েই অশোক হঠাৎ লাফিয়ে খাট থেকে নেমে তরতর করে নিচে চলে গেলো। আজ মিনি বলেনি, ছুটি দাও! কিন্তু এ নিষেধ আরো গুরুতর, আরো দুঃখের, আরো ভীষণ। সে চুম্বন করেছিলো মিনিকে নয়, তার কঙ্কালকে। মিনির রোগা রক্তবর্ণহীন গালের তীক্ষ্ণ কঙ্কালকে যা দেখা যায় না কেবল স্পর্শ দিয়ে বোঝা যায়।

অশোক ছুটে বাগানে বেরিয়ে গেলো, কেউ নেই সেখানে। আস্তাবল থেকে কোদাল খুঁজে এনে সে উন্মাদের মতো কুস্তির আখাড়াটা কোপালে—একবার, দুবার, তিনবার। তার সর্ব অঙ্গের পেশী স্ফীত হয়ে উঠলো, ঘামে মাটি ভিজে গেলো স্থানে স্থানে। মন্দার সৃষ্টি করা উত্তেজনা দেহ থেকে ধুয়ে গেলো, কিন্তু মিনির এই যে নূতনতরো ব্যাহত করা তার মন পূর্ণ করে রইলো।

বিকালে মন্দা এলো মিনির কাছে। সকালের ঘটনা মিনির জানা থাকলে সে বুঝতে পারতো মন্দা নিশ্চয়ই আসবে — তার পাতা ফাঁদে পড়ে অবোধ জন্তুটা কেমন করে ছটফট করেছে তার খোঁজ নিতে। পরীক্ষাটা নৃশংস কিন্তু তার আকর্ষণ কম নয়।

মন্দা মিনিকে আদর করলে, তার চুল বেঁধে দিলে। নানা সাংসারিক

কথা কইতে কইতে এক সময়ে মিনিকে জড়িয়ে ধরে বললে, তুই কি হয়ে যাচ্চিস মিনি ?

কেন, বেশ তো আছি ! মিনি হাসলে। তার সব ক্ষণের হাসিই এখন ম্লান, উজ্জ্বলতা নেই, মাধুর্য নেই।

বেশ আছিস না আর কিছু ! তুই আগেকার মতো পূর্ণ হয়ে ওঠ না ভাই ! বলি ? ও মিনি, বলি ?

মন্দা প্রতিপক্ষ হলেও মিনি তাকে ভালোবাসতো তার প্রসাদগুণের জন্য এবং তার গানের মতো কথার এই বিশেষ ঢঙও মিনিকে প্রভূত আনন্দ দিতো। সে উত্তর দিলে, বলোনা দিদি।

তুই পূর্ণ না হলে আমার যে তৃপ্তি নেই ভাই !

মিনি এ-হেঁয়ালি ভেদ করতে পারলে না কিন্তু লক্ষ্য করলে মন্দার আয়ত নয়ন ঝিকমিকিয়ে উঠলো। সে কোনো উত্তর দিলে না।

মন্দা ভাবছিলো, ওর পরাজয় আমি চেয়েছি কিন্তু এমন করে চাইনি। সে মুখে বললে, চলনা, আমার কাছে কিছুদিন থাকবি ! বল, থাকবি ? বলি তোর শাশুড়ীকে ? অশোক 'না' বলবে না জানি। বল্‌না ভাই ?

মিনি সবেগে মাথা দুলিয়ে বললে, না না, না ভাই। আমার কুণ্ঠা বাড়বে। ভাবলে, যা নেপথ্যে আছে থাক, তাকে চোখের সামনে টেনে আনি কেন ?

একদিন মন্দা বললে, আমি ছবি তুলবো। সব শিখবো কিন্তু তা বলে দিচ্ছি।

অশোক বাড়ি ছুটলো। কোডাকটা নিয়ে এলো, ফিল্ম কিনে আনলে। যা সহজে হয় মন্দা রোদে প্রমোদ অশোক রঞ্জু মালী বেয়ারা সকলকে একে একে দাঁড় করিয়ে স্ন্যাপশট্ তুললে। তারপর ক্যামেরাটা অশোকের হাতে দিয়ে বললে, এই নাও, শিব গড়লুম কি বাঁদর গড়লুম তুমি জানো।

বাড়ি গিয়ে ওটা ডেভেলপ করবো বৌদি, বিকেলে নিজের কীর্তি দেখতে পাবেন।

না না, বলেছি না আমি সব শিখবো! যা হবার এখানে হবে। চিরদিন তোমার হাতে থাকি আর কি!

তাহলে রাত্রি ছাড়া উপায় নেই যে? ডার্করুম কোথা পাবো?

সন্ধ্যায় অশোক আলো প্লেট ওষুধপত্র নিয়ে এলো। মন্দা বললে, এখন নয় খেয়ে দেয়ে। আপনার জ্বালায় ঘরকরনার কাজ হবার যো নেই। ওগো, তুমিও দেখবে নাকি ডেভেলপ করা? বেশ তো ক্যামেরা হাতে করে অশোকবাবুর মতো পরের বৌ দেখে বেড়াবে, অন্ধকারে তোমার হৃদয়পটে তাদের ছবি অল্পে অল্পে ফুটে উঠবে!

খাওয়া চুকলো। প্রমোদ শয্যা নিলে। মন্দা বললে, ওমা, শুলে যে? এমন কথা তো ছিলো না! ওঠো বলছি। তোমার কি নতুন কিছুই জানতে ইচ্ছা করে না?

জড়িত স্বরে অনুনয় করে প্রমোদ উত্তর দিলে, আজ থাক। সম্ অদার ডে, মন্দা ডার্লিং! সে পাশ ফিরে শুলো।

ঘরে মোমবাতির রুবি আলো। অশোক মেজার গ্লাসে পাইরো সোডার

বড়ি গুলে রাখলে। একটা প্লেটে হাইপোর জল পরিপূর্ণ করে রেখে হাত ভালো করে ধুয়ে বললে, এইবার বারান্দার আলো কমিয়ে দরজাটা বন্ধ করুন বৌদি।

দরজা বন্ধ করে, টাঙানো কম্বলটা ফেলে দিয়ে মন্দা এসে বসলো। অশোক চেয়ে দেখলে এ আলোয় মন্দা যেন স্বপ্ন-ছায়া, মানুষ নয়।

লাল মোটা কাগজের আস্তরণ থেকে ফিল্মটা বার করে কাঠের ক্লিপ দিয়ে তার দুটো প্রান্ত আটকে অশোক ফিল্মটাকে বালতির জলে ভেজালে! মন্দা তার নির্দেশমতো পাইরো-সোডার জলটা একটা প্লেটে ঢেলে দিয়ে তার একটা কানা উঁচু করে ধরে রইলো।

ফিল্মে আলো ছায়ার অংশ ক্রমশ জেগে উঠতে লাগলো। ওই দেখুন বৌদি, প্রেতের দল। মন্দা ঝুঁকে পড়লো, তার চূর্ণ কুন্তল অশোকের গালে বুলিয়ে যেতে লাগলো। এইটা আমি, ওই রঞ্জু—চারটে মাথা হয়ে গেছে তার। মন্দার নিশ্বাস লাগতে লাগলো অশোকের মুখে।

ও অশোক! স্বর অত্যন্ত মৃদু, মদালস, আশ্চর্য। আমাকে 'তুমি' বলো না কেন? আমি তো বলি তোমাকে!

এই দেখুন প্রমোদদা। সব কালো ছায়াটা ওঁর শাদা স্যুট। দেখছেন?

আচ্ছা, আমায় কখনো কিছু দাওনি কেন? ইচ্ছা করেনা দিতে?

তা ঠিক বৌদি, দিইনি। করে বইকি ইচ্ছা, কিন্তু কি দেবো ভেবে পাইনি আজ পর্যন্ত।

ভেবেছো নাকি? বলো না!

তা ভেবেছি বই কি, বৌদি।

দিও এমন কিছু যার স্থায়ীত্ব নেই, যা ক্ষণিক সৌরভ দিয়ে, পরম তৃপ্তি দিয়ে উড়ে যাবে। আবার তার চূর্ণ কুন্তল অশোকের গালে বোলাতে লাগলো।

অশোক ফিল্মটা এবার হাইপোর পাত্রে ডোবালে। সেটা নাড়তে নাড়তে বললে, এইবার সব ফিল্মটা কালো হয়ে যাবে বৌদি, তারপর আলো ভেদ করে যাবার মতো স্বচ্ছ হয়ে যাবে।

মন্দা কিছু না বলে সমুখ দিকে ঝুঁকে পড়লো দেখবার জন্য। তার কাঁধ অশোকের কাঁধে লিপ্ত হয়ে গেলো। সে মৃদুস্বরে যেন আপন মনে বললে,

এক যো দিল থা বহ্ ভী খো বৈঠে
অচ্ছে খাসে ফকীর হো বৈঠে।

কি বলছেন বৌদি, এ বয়সে ফকীরি কেন ?

কিছু না এমনি বললুম, হঠাৎ মনে পড়ে গেলো কি না! তার কাঁধ সরে গেলো। মন্দা মুখ তুলে অভিসাররত এলোমেলো চুল সামলে নিলে।

জলে ধুয়ে ফিল্মটা বারান্দার হাওয়ায় টাঙিয়ে দিয়ে অশোক বললে, এইবার যাই বৌদি।

মন্দা তার বাইকের আসনে হাত রেখে ফটক পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেলো। ফটকের এপারে দাঁড়িয়ে বললে, তুমি যেমন ভীতু তেমনি কৃপণ, নও ?

মিনি ? অশোক মিনিকে অলিঙ্গনে বেঁধে ডাকলে, মিনি ? অনেকক্ষণ

পরে যেন সাত সমুদ্রের ওপার থেকে সাড়া এলো, উঁ। হারানো-মনের চমক-ভাঙা সাড়া। দুজনে শুয়ে রইলো দেহসংলগ্ন করে কিন্তু মাঝে রইলো বাক্যহীনতার দুস্তর নিষ্ঠুর মরুভূমি।

পরদিন সকালে অশোক লক্ষ্ণৌ গেলো। আমিনাবাদ ও হজরতগঞ্জের বাজার মন্থন করে কিনলে রোজার গ্যালের 'লাইট অব এশিয়া' আর কস্তরী সাবান; যে-সৌরভ আর ফেনক তাদের স্থায়ীত্বের পরিধিতে নিজের প্রিয়তমাকে পরকীয়া করে, পরকীয়াকে বুকের কাছে এনে দেয়।

মন্দা সে দুটো হাতে নিয়ে অশোকের মুখের ওপর দৃষ্টি স্থাপন করে বললে, শেষে এই দিলে তুমি? আচ্ছা। কিন্তু এতো মানুষের হাতের তৈরি বস্তু, মানবীয় নয় তো। মন্দার চোখ জ্বলে উঠলো। আবার বললে, সেণ্ট মাখে কোথায় জানো, জানো না? মাখে কর্ণপটাহের পিছনে, ঘাড়ে—আর—আর, সে খিলখিল করে হেসে উঠলো—রাক্ষসীর কুটিল মারাত্মক হাসি।

সেণ্ট মাখার সন্ধিস্থানগুলির সঙ্গে অশোকের অপরিচয় ছিলো না, সে মাথা নিচু করলে। তার সমগ্র মুখমণ্ডল রক্তের খরপ্রবাহে উষ্ণ হয়ে উঠলো।

পরদিন আবার ক্যামেরা নিয়ে অশোক মন্দাকে বললে, এই নিন বৌদি, ছবি তুলুন।

আর শখ নেই আমার। ওটা একদম বাজে ব্যর্থ জিনিস, হাতছানি দেয় কাছে আনে না, তা জানো?



বারো

এ কি ভালোবাসা, না শুধু কামনা ? মিনি শাদামাটা মেয়ে, ভাবনাগুলি তার সহজ শাদাসিধে। চুলচেরা প্রশ্ন যেমন তার মনে ওঠে না, ওঠে যদি তেমনি জট ছাড়াবার ক্ষমতাও তার নেই। অশোক কি করতে সকালে লক্ষ্ণৌ গেছে। দুপুরে মিনি নিজের বাহুতে মাথা রেখে নানা কথা ভাবছিলো। এক সময়ে আপনিই তার মন জিগগেস করে উঠলো, এ কি ভালোবাসা, না শুধু কামনা ?

কথা দুটো। তার সংজ্ঞাও ভিন্ন কিন্তু মিনি জানে ও দুটো বস্তুই এক—যা ভালোবাসা, সেই কামনা, যা কামনা সেই ভালোবাসা। সে ভাবছিলো আর তার চোখের সামনে মন্দা আর অশোক যেন এক হয়ে উজ্জ্বল হয়ে ছিলো। পুরুষ আর রমণীকে এক করে ভাবতে গেলে ওই ভালোবাসার সম্বন্ধটাই মনে আসে বৈকি। মিনি ভাবলে, কামনা ভালোবাসারই অন্তর্গত বস্তু, তার আর আলাদা কোনো রূপ নেই।

আমার পালা কি ফুরোলো ? মিনি তীব্র বেদনায় চমকে উঠলো। সব পালা ফুরোবারই অন্তর মন্থন-করা বেদনা আছে। তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে তার বাহু ভিজে গেলো। তুমি তো আসো তেমনি করে! না, আর আসো না তো! আগে নৈবেদ্যটা ছিলো সমগ্রভাবে আমার

একলার, চোখ বুজিয়েও তা বুঝতুম, বরং বেশি করেই বুঝতুম চোখ বন্ধ করলে। এখন সে-নৈবেদ্য এক থালায় সাজিয়েও কে হাত দিয়ে মাঝামাঝি খাঁজ কেটে দুভাগ করে দিয়েছে দুজনের উদ্দেশ্যে। এ কী বিড়ম্বনা তুমি জানো? জানো না। কতো গভীর গ্লানি অপমান, কী মর্মজ্বালা এ তুমি বুঝতে পারবে? পারবে না তো! তোমার বণ্টনকরা মনের এক টুকরো আমি নেবো কেন? কোনোদিন তো তার অংশ নিয়ে, তোমার আবেগের পরিশিষ্টটুকু নিয়ে আমি অল্পে তৃপ্ত হতে শিখিনি! বরং আমি ভেবেছি স্বল্প আমি, এতোটুকু আমি, মূক আমি। লজ্জা পেয়েছি পূর্ণ নই বলে, সাড়া দিতে পারিনি বলে, যেমন সাড়া দেওয়া আমার উচিৎ ছিলো। তবুও ধন্য মেনেছি নিত্য—মানিনি? বলো না তুমি? আমার চোখে দেখোনি কি বিশ্বের তৃপ্তি, দেখোনি কি তোমার পরিচয়? মন ভরা ছিলো আমার, কিন্তু ভরাডুবি হয়ে গেলো, হোলো কোন গাঙে?

বেদনা হয়তো আগেও দিয়েছো, কিন্তু সে তো বাহ্যিক বেদনা। বেদনা নয়, সুখ-বেদনা। মনে করোনা চক্ষুওয়ালায় সে-দিনের কথা। হামকে দুলছিলুম দুজনে। হঠাৎ আমাকে টুক করে তুলে নিলে আমার হামক থেকে তোমার বুকের ওপর। কিন্তু তোমার হামকটা ভার সইলো না, ছিঁড়ে গেলো। পড়লুম শক্ত মাটিতে, কোমরে লাগলো। পনেরো দিন খুঁড়িয়ে বেড়ালুম, কিন্তু ব্যথা ছিলো না তো কোথাও, ছিলো কি? প্রতি পদবিক্ষেপে যা বোধ করতুম তা বেদনা নয়, সুখ-আনন্দ। ব্যথা টনটনিয়ে উঠতো, কিন্তু ছাপিয়ে যেতো সুখবোধ, স্নিগ্ধ প্রলেপের মতো।

সেই বিশেষ ক্ষণের সুখ তৃপ্তি আনন্দ। আমার শিরায়-শিরায় আত্মায় যেমন তোমার পুরুষালির পরিব্যাপ্তির অনুভূতি। সে তো বেদনা ছিলো না, ছিলো আনন্দের স্মারক হয়ে।

এখন তোমাকে কি ভাবি জানো? কাছে আসো, আসো আঁখিভরা আবেশ-বিহ্বলতা নিয়ে, আমার আকুল বাহু দুটি আপনি তোমার পানে প্রসারিত হতে চায়, কিন্তু ঘোর আপত্তি ওঠে অন্তর থেকে আমার শিরায়-শিরায়, দেহের কোষে-কোষে। ভাবি স্পর্শদোষে দুষ্ট তুমি, কলুষ হয়ে আছো। গা শিরশির করে ওঠে, জিভ বাগ মানে না, আপনি বলে ওঠে—ওগো, আজ নয়, আজ ছুটি দাও। বলে না, কাল এসো, কাল আসবে মিলনের শুভক্ষণ। আমার এখনকে যেমন ভয় আগামী কালকেও তেমনি। আমার শীর্ণ মুখ, ম্লান দৃষ্টি তোমাকে ব্যাহত করে জানি, কিন্তু আমি বেঁচেছি। মনে ভাবি বেঁচেছি। তেমন করে একনিষ্ঠ হয়ে পূর্ণ করে ভালোবাসো—আমি আছি, তেমনি পূর্ণ করে তদগত হয়ে কামনা করো—আমি আছি। আমিই তো তোমার। কামনা মেটাবার, চুকিয়ে দেবার আমি নয়, সুখে অতৃপ্তির আমি, তাতে ইন্ধন জোগাবার আমি।

বলেছিলুম তোমাকে মন্দাদি, আমিও প্রকৃতি-নটী, সহজে কলাবতী। সংসার আমাকেও শিখিয়ে নেবে। নিলে না তো! হার মেনেছি ভাই। প্রকৃতি বুঝি সকল নারীকে নটী করে না? সহজে কলাবতী করে না? নটী নয় যারা তারা কি কেবল পরাজয় মানে? তারা কি কেবল নিজের প্রিয়তমকে নটীর চটুল নূপুরভঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ করতে ফেলে দেয়, তুলে দেয়

নটীর বুকে? পুরুষের দুনিয়ায় নটীর মন্দিরই কি বড়ো? পত্নীর রচনা-করা গৃহচ্ছায়া শুধুই অকিঞ্চিৎকর?

মিনি ব্যাকুল হয়ে কাঁদলো। কাঁদতে কাঁদতে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়লো।



তেরো

এ কি ভালোবাসা, না শুধু কামনা? মন্দা ধীর অভিজ্ঞ নারী। সমস্যা যেমনই হোক না কেন চুল চিরে সেটাকে খণ্ডবিখণ্ড করার বিদ্যা তার অধিগত, বিশ্লেষণ করা তার স্বভাব। দুপুর বেলা খাটের শিরানায় ঠেস দিয়ে দেহ এলায়িত করে বসে পড়তে পড়তে সেও ভাবছিলো। হাতে পাতার মাঝে তর্জনী রেখে বন্ধ করা লিয়োন এব্রিয়োর বই *Dialoghi D'Amore*-এর ইংরাজি অনুবাদ। সম্প্রতি সে কলকাতা থেকে বাপের পুরানো গ্রীক রোমক বইয়ের ইংরাজি সংস্করণগুলো আনিয়েছিলো এবং কিছু কাল থেকে তন্ময় হয়ে পড়ছিলো। পিণ্ডার, ওভিড, লুসিএন, পলাস সাইলেণ্টেরিয়স এবং আরো কতো কি। তার এ-পাঠস্পৃহা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। বাপ ছিলেন হেডনের পন্থানুবর্তী সুখবাদী, মেয়ে মন্দাও উগ্র হেডনিষ্ট—সুখপিপাসায়, রূপ-রস-পিপাসায় কামনার জালে জড়ানো বাপেরই মতো।

মন্দা ভাবছিলো, ভালোবাসা তাই যা পাওয়া হয়ে গেছে। আর কামনা অনধিগত সেই বস্তু যাতে আনন্দ আরামের ইঙ্গিত আছে অথচ যা মরীচিকার মতো, ধাঁধার মতো, সতত দূরবিসর্পী পিচ্ছিল সঞ্চরণশীল, উন্মাদকরা যার হাতছানিটুকু। মন্দা নিজেকে বললে, তৃপ্তি আছে কি না জানিনে তো! এখনো তো আমার কামনা পূর্ণ হয়নি, আনন্দের

ইঙ্গিতেই চলেছি ছুটে। কিন্তু এব্রিয়ো আবার মনে ভয়ও ধরিয়ে দিয়েছে, কামনা পূরণের গাঢ় প্রতিক্রিয়া আছে। যাকে চাইছি একদিন তাকেই ঘৃণা করতে হবে? একদিন সেই আমার বিরক্তির কারণ হবে? থাকগে প্রতিক্রিয়া, পাই তো আগে।

আপন মনে তর্ক করতে করতে কখন একসময় সে দিবাস্বপ্নে ডুবে গেলো। কল্পনা দিয়েই তো ভালোবাসা! কল্পনাই তো কামনার শক্তি! তার স্বপ্নাতুর চোখের সামনে মায়া অশোক এসে দাঁড়ালো, জিগগেস করলে, ওটা কি বই বৌদি?

অশোক খাটের ধারে বসলো। মন্দা মুচকি হেসে বইয়ের প্রথম পাতাটা খুলে এগিয়ে দিয়ে প্রথম বাক্যটায় আঙুল বুলিয়ে দিলে। সে মুখে আঁচল তুলে দিয়ে হাসলে, ঘুমন্ত দুল দুটো তার ঝিকিমিকি দোলায় জেগে উঠলো। মন্দা বললে, পড়োনা, বলো না আমাকে ও-কথা! ও অশোক, এবার তো তোমার পালা এলো আক্রমণক হবার, এলো না? তার কল্পনার স্বপ্ন-রচা অশোকও মৃদু হাসলে, মধুর কণ্ঠে পড়লে—*My acquaintance with you, O Sophia, awakes in me love and desire.*

মন্দা কতোবার ও বাক্যটা পড়েছিলো কিন্তু অশোকের কণ্ঠস্বরে তার গা শিরশিরিয়ে উঠলো। আয়তচক্ষে তার দিকে চেয়ে মন্দা বললে, ও অশোক, ছেলেবেলায় কতো বাল্যসঙ্গিনীর সঙ্গে বৌ-বৌ খেলেছো তা জানি। এসো না খেলি নূতনতম খেলা! আমি সোফিয়া, তুমি হও ফাইলো, হবে? নূতন *Dialoghi D'Amore*—প্রেমতত্ত্ব তৈরি করবো

আমরা অবশ্য সকল আধ্যাত্মিক হিজিবিজি বাদ দিয়ে, কি বলো?

ভালোবাসা কি জানো অশোক? ভালোবাসা ব্যাঙ্কে গচ্ছানো অতিরিক্ত ধনের মতো,ব্যবহার নেই কিন্তু থাকার তৃপ্তি শান্তি নিরপত্তাবোধ আছে, হয়তো বা সুদবৃদ্ধিও আছে তার। তুমি সেটাকে কি ভালো বলবে? হয়তো ভালো। কিন্তু যাতে শিহরণ জাগানো নেই, পাগল করা যা নয়, সে কি ভালো? আমি ভালোবাসা চাইনে। চাইনে যা দ্রব নয়, যা শুধু জমানো আঁটল বরফ খণ্ডের মতো। বিধাতা আমাকে গড়েছেন কামনা দিয়ে—দিওয়ানা হবার মতো কামনা দিয়ে। না থাক তাতে নির্ভরতা, না থাক চরম তৃপ্তি। কিন্তু কামনার কি অপরিসীম শিহরণভরা আনন্দ, কি উদ্দাম-উত্তাল আকুল তরঙ্গ তার আমার রক্তে, কি বলবো!

পাপ হবে না বৌদি? শুনেছি তো কামনা পাপ।

ভাগ করে আলাদা করে দিলুম বলে তাই দেখছো কামনা অন্য বস্তু। কিন্তু লোকে জানে ভালোবাসা আর কামনা একই। তা যাই হোক, সত্যি-মিথ্যের কড়ি কে ধারে? কামনাই তো ভালোবাসার রাজপথ অশোক! তবে পাপ হতে যাবে কেন?

শুনেছি তো তাই, জেনেওছি তাই। না হলে মনে এতো আপত্তি কেন, নিষেধ ওঠে কেন?

ওঠে মানুষের রচা সংস্কারে, সহজ সংস্কারের কারণে নয় অশোক। জানো কি, ভালোবাসাই এই তিক্ত বিশৃঙ্খল সংসারটাকে জোড়াতাড়া দিয়ে এক করে রাখার একমাত্র আঠা। জানো না?

নূতন কথায় অশোক চমকে উঠে মন্দার দিকে চাইলে, কিছু বললে না।

মিনি কেমন আছে? তার মানে তার মন কেমন আছে? জানো? না, সে খবরটুকু রাখো না? দেহ তার সুস্থ নয় তা তুমিও জানো আমিও জানি। মনও তার বোধ হয় ভালো নেই।

তাই দিয়েই তো ওই এক ফোঁটা চালাক মেয়েটা আমাকে ব্যর্থ করেছে।

তার মানে বৌদি?

মন্দার চোখে আগুন ছড়ালো। ক্ষণিক সে অশোকের দিকে চেয়ে থেকে বললে, মানে জানো না? কি বুঝলে এতোদিনে? জানিনে কেমন করে মিনিকে ভালোবাসো তুমি! তুমি কি শুধু স্বামী, না প্রেমিক আর্টিস্ট? বলো না? স্বামী তো শুধু ব্যর্থ জীব, বায়োলজিক্যাল জন্তু, কুকুর বেরালের মতো! মন্দা খিলখিল করে হেসে উঠলো। আর্টিস্টই তো রসিক জন, নয়?

স্বামী জানি কিন্তু এ-আর্টিস্টকে তো জানিনে!

অর্থাৎ দেহই জানো, জৈব শক্তিটাকেই কেবল মানো। প্রেম কি তা জানো না?

হয়তো জানিনে, কিন্তু মিনি কেন আর কি করে ব্যর্থ করলো আপনাকে?

মন্দা পায়ের ওপর শাড়ি টেনে দিলে, মুক্ত বাহু ছুটি শাড়ি দিয়ে চাপা দিলে। তার এ-চকিত ভঙ্গিমায় অশোক চমৎকৃত হয়ে বললে, পদ্ম হঠাৎ মুদে গেলো কেন বৌদি? বলুন না, মিনি কি করে ব্যর্থ করলে আপনাকে?

শুনবে? প্রেম তার মধুরতম অংশে বিলম্বিত কেলি—কল্পনা সোহাগ চাতুর্যে লীলায় অপূর্ব অবর্ণনীয়। যতো বিলম্বিত সেটা ততো তার মাধুর্য আবেগ বিহ্বলতা ঘনীভূত মোহ—যা দিয়ে তোমরা কাব্য গড়ো, উপন্যাস গড়ো, জীবনে যা প্রতিফলিত না করতে পেরেও যার সাক্ষীস্বরূপ হয়ে বৃথাই কেবল যৌবনের অহঙ্কার করো। প্রেমের কর্কশ অংশ যা, তা তো ক্ষণিক দ্রুত—নিছক ফিজিওলজি। মন্দা আবার খিলখিল করে হেসে উঠলো। কেলির মাধুর্যের দায় আমি বইছি, বইছিনে? অন্য দায়টা মিনির। চক্ষে বিজলী হেনে মন্দা খাট থেকে লাফিয়ে পড়ে পালিয়ে গেলো।

খানিক পরে ফিরে এলো পান নিয়ে। অশোকের হাতে পান দিয়ে বললে, অমন ত্রিভঙ্গিম আকার ধরলে কেন? আরাম করে শোও না! সে একটা বালিশ ছুঁড়ে দিলে খাটের এ-ধারে। নিজে বসলো শিরানায় ঠেসান দিয়ে পা ছড়িয়ে। ও অশোক, এখন আমাকে গুরু বলে স্বীকার করো, না করোনা? কতো কি তোমাকে শেখালুম বলতো?

কই আর শেখালেন! অমন বই-পড়া বিদ্যে আমারো ঢের আছে।

ওমা, বলো কি! মন্দা মুখে আঁচল দিলে, শুধু তার কৌতুকোদ্ভাসিত চোখ দুটি বেরিয়ে রইলো। তাই বুঝি তোমার লেখাপড়া হোলো না বইয়ের বিদ্যায় বিরাগ বলে? ও অশোক, ভোকেশ্যনল্ এডুকেশন চাই নাকি তোমার—মানে, যা হাতে-কলমে শিখতে হয়? সারলে আমাকে! দুজনের হাসি একতারায় বেজে উঠলো। ভ্রূভঙ্গী করে মন্দা বললে, তা তো হয়না। আমার আকাশতলে শুধু তাপ, যদি বারিধারা

চাও তাহলে তোমাকে পর্জন্যঘেরা অন্য আকাশতলে যেতে হবে যে! নাও না মিনিকে সারিয়ে! আমি তোমাকে আবেগের স্রোতে ভাসিয়ে দিই, সে তোমাকে হাবুডুবু খেতে না দিয়ে উদ্ধার করে নিক, জগতে ধন্য ধন্য রব উঠবে উদ্ধারকর্ত্রীর। কতো তো স্রোত, তুলে যদি নাই নেবে তো মিনি তোমার পত্নী কিসের? বলো না?

ওসব কথা থাকগে বৌদি। অনেক দিন গান শুনিনি আপনার, গান না!

শুনবে গান? গাইতে পারি যদি ভালো লাগলে অর্ঘ দাও। কিন্তু কঙ্কণ নয়, কণ্ঠহার নয়, সিঁথিমৌর নয়। দরিদ্র যে ধনী, ধন ছাড়া আর কিছু নেই যাদের, তারাই শিল্পীকে ওই মোটা খেলো দান দেয়।

আচ্ছা আপনি গান, আমি মনে মনে ফুলের অন্তর্কোষ থেকে ভ্রমর ধরে তার পাখায় মাখা ফুলের পরাগ সংগ্রহ করে থালা সাজাই। কি বলেন?

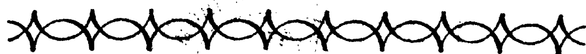
মন্দা তখন স্বপ্নসমুদ্রের অতল তলে। চোখ বন্ধ করে গাইলে:

কেন মোর গানের ভেলায়
এলেনা প্রভাত বেলায়।
হলেনা সুখের সাথী
জীবনের প্রথম দোলায়।

কাব্যশ্রী গীতশ্রী মন্দার বেদনাকুল পিলু বারোয়াঁয় তার স্বপ্নরচিত অশোক আচ্ছন্ন হয়ে গেলো।

মন্দা বাহু বাড়িয়ে হাত দুটি পেতে দিয়ে বললে, কই কি দেবে বলেছিলে, দাও! সে নিজেই নিজেকে অর্ঘ দিলে অশোকের হয়ে। অস্ফুটস্বরে গ্রীক কবি দায়োসকরিদেসের কবিতা আবৃত্তি করলে:

They drive me mad, your rosy lips,
The vermeil gate of song,
Wherefrom my soul its nectar sips,
And your soft whispering tongue.
Your eyes a liquid radiance dart
Beneath their lashes close,
Traps to ensnare my fluttering heart,
And rob me of repose,
Your breasts, twin sisters firmly grown,
A milky fountain pour,
Two hills that love their master own,
More fair than any flower.



চোদ্দ

একি ভালোবাসা, না শুধু কামনা? সকল বিষয়ের সহজ সমন্বয় করে নেওয়া অশোকের মনের ধর্ম, চুলচেরা বিচার করা তার কাজ নয়। সে রাত্রের প্যাসেঞ্জারে বাড়ি ফিরছিলো। চন্দ্রালোকিত ধরিত্রী পিছনপানে ছুটে চলেছে, চিন্তালিপ্ত অশোকের মনে হচ্ছে গাড়িটা স্থির কেবল ধরিত্রীই ধাবমানা। তার কামরাটি খালি, জানলায় মাথা রেখে সে ভাবছিলো নানা কিছু।

কয়েকদিন জ্বরে পড়ে অশোক নিজেই আশ্চর্য হয়েছিলো। জ্বর-জাড়ি অসুখবিসুখ কি তার জানা ছিলো না। কালধর্মে তখন সকলেই নানা ছোটখাটো অসুখের নাম আর ব্যবহার শিখছিলো; বৈজ্ঞানিকতার শুচিবায়ু ঢুকেছে ঘরে ঘরে, তার ও-বালাই ছিলো না। কিন্তু তার আরো আশ্চর্য হবার কারণ হোলো মিনির নূতন রূপ। যে মিনি বিমুখ হয়ে থাকতো, নিজের মনের কবাট যে বন্ধ করে রেখেছিলো, সেই মিনি অশোকের সেবায় সম্পূর্ণ সহজ মানুষ হয়ে গেলো পুরানো দিনের মতো। কয়েকদিন দেখে দেখে অশোক ভাবলে অসুস্থ হলেই যদি মিনিকে এমন করে পাওয়া যায় তাহলে অসুখটা দীর্ঘস্থায়ী হোক। কিন্তু তার বেহায়া দেহ সে-কথা শুনলে না, অসুখ ফুরালো আর মিনিও ফিরে গেলো

দুরবীনের উলটো দিক দিয়ে দেখা দূরের অনাত্মীয় মানুষের দলে। সে সন্ধ্যাবেলা মন্দার বাড়ি গিয়েছিলো। প্রমোদ নেই, মন্দা দুহাত মাথার ওপর রেখে থামে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে আছে। অশোক এদিক দিয়ে বারান্দায় উঠে তাকে চমকে দিয়ে বললে, ও বৌদি, পরস্ত্রী দেখতে এলুম।

এসো এসো। পরকীয়া তোমার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলো। বসো। পরকীয়াকে অমনি দেখতে নেই, জানো! বলো, মধু মধু মধু! মন্দা মধুর হাসি হেসে উঠলো। ভ্রূভঙ্গী করে বললে, মিষ্টি পরস্ত্রীর কাছে এসে বলতে হয়, মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি—থাকগে, পাষণ্ডকে বেদবাক্য শোনাতে নেই। তুমি বড়ো পাষণ্ড। শুধু বললেই হোলো, মধু মধু মধু। বলো না, পরকীয়ার মতো এতো মিষ্টি, নিহিত মাধুর্যে এমন ভরপুর, নবীনতায় এতো সরস আর কিছু আছে? ও অশোক?

প্রীতির হাসি হেসে অশোক বললে, সাবাশ বৌদি! আঃ এতোদিনে দেহমন থেকে জ্বরের গ্লানি গেলো।

দাঁড়াও, পরকীয়া বলেছো, তোমাকে চা-পান বকশিস দিই আগে। জানো, ছেলেবেলা থেকে যখন বৈষ্ণব কবিদের ঘাঁটতে আরম্ভ করেছিলুম তখন থেকে মনে বড়ো সাধ ছিলো কারো আদরের চিন্তাসুখের পরকীয়া হবো। সার্থক করলে আমায়, কি বলো!

কিন্তু আমার পরকীয়াটি ভালো নয় বৌদি, শুধু বাক্যবাগীশ। অসুখের সময়ে তিনি একবারও দেখতে যাননি।

মন উসখুস করতো নাকি? ও অশোক? যেতে ইচ্ছা করলেও

ইচ্ছাদমন করেছি, জানো? তোমায় রোগায়ত্ত অবশ দেখা মর্মান্তিক হতো। আর রোগশয্যার পাশে পরকীয়া যে বাহুল্য! যাহোক, বড়ো রোগা হয়ে গেছো কিন্তু! মন্দার দৃষ্টি থেকে স্নেহ ঝরে পড়লো।

আয়া দূরে ঘোমটা টেনে এসে দাঁড়ালো। মন্দা জিগগেস করলে, ক্যা জগদেও কে মাঈ? ঘোমটার ভেতর থেকেই সে উত্তর দিলে, বাবা সো গয়া সরকার। ময় যা সকতী হুঁ?

অচ্ছা যাও। ও অশোক ভেতরে এসো, এখানে হিম আসছে। আজ বাইকে আসোনি তো?

না বৌদি গাড়িতেই এসেছি। আজ আর বাইক চড়বার ক্ষমতা নেই।

অশোক বিছানার ধারে নিচু কুর্সিটায় বসলো। মন্দা রঞ্জুর কাছে বসে ঘুমন্ত শিশুর কপালের চুল সরিয়ে দিলে, তারপর হঠাৎ ঝুকে পড়ে রঞ্জুর গালে গাল রেখে অশোকের দিকে বড়ো বড়ো চোখ দুটি তুলে বললে, আর অসুখে পোড় না অশোক, অসুখ বড়ো পিছিয়ে দেয় মানুষকে। প্রত্যেক বার দেহে নানা দাগ রেখে যায়। হঠাৎ মন্দা রঞ্জুকে চুমো খেলে; মায়ের সহজ চুম্বন শিশুর মুখে, অশোক দেখেও দেখলে না প্রথমে। কিন্তু পরক্ষণে চমকে উঠলো, তার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিলে। মন্দার চুমো আর থামে না। ঘুমন্ত শিশু অবশেষে মুখ কুঞ্চিত করে পাশ ফিরে শুলো।

মুখ তুলে মন্দা বললে, আচ্ছা তুমি সিগারেট খাওনা কেন? ধোঁয়ার তবু একটা পর্দা থাকে। বলোনা, খাবে সিগারেট?

রাইট য়ু আর মন্দা। অশোককে ও-সব শেখাতে পারো জায়গীর দেবো

তোমাকে। আমি তো পারলুম না। প্রমোদ কথা বলতে বলতে ঘরে এসে দাঁড়ালো। কি বলো অশোক, টানবে তামাক? তাহলে গোলকামরায় এসো। অশোকের কাঁধ চাপড়ে দিয়ে জিগগেস করলে, তারপর হর্‌কিউলিস্, আছো কেমন?

অশোক তার সঙ্গে সঙ্গে গোলকামরায় গেলো, বললে, এলুম বলে মনে করবেন না যেন যে তামাক টানতেই এলুম।

তোমার দ্বারা কিছু হবেনা। স্বর্গে যদি যাও—আই হোপ য়ু উইল গো দেয়র, যা কট্টর খাঁটি লোক তুমি—তাহলে পৃথিবীর যতো শুষ্ক লোক অর্থাৎ ভালো লোক তাদের সঙ্গে বাস করতে হবে। এই ধরো সক্রেটিস, বুদ্ধ, চৈতন্য—পারবে? মারা যাবে হে মারা যাবে। আমার মতো নরকযাত্রী হতে শেখো ফুর্তিতে থাকবে। ইট ইজ বেটর টু রেন ইন হেল্ দ্যান টু সার্ভ ইন হেভ্‌ন্, কি বলো?

মন্দা এলো, বললে, আহা, ওঁকে অভিসম্পাত করছো কেন? আমার ওই একটি মাত্র মর্মসাথী। ও অশোকবাবু, গান শুনবেন, না গালাগালি শুনবেন? মন্দা মিউজিক স্টুলে বসে বাজনার ডালা খুললে।

প্রমোদ বললে, থ্যাঙ্ক য়ু মন্দা। তাহলে বেহালাটা আনাও আগে।

অশোক পরিতৃপ্ত হয়ে সে রাত্রে বাড়ি ফিরেছিলো।

আর একদিনের কথা অশোকের মনে পড়লো। সেদিন সকালে গিয়ে সে দেখলে প্রমোদ তার অফিস-কামরার সামনে ছোট বারান্দায় বসে

মুন্সীর উর্দু নথী-পাঠ শুনছে। তার কাজে ব্যাঘাত না ঘটিয়ে অশোক পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলো, প্রমোদ দেখতে পেয়ে বললে, মন্দা দখিন বারান্দায়, দেখোগে শী হ্যাজ গন ম্যাড। গিয়ে দেখলে মন্দা ইজেলের সামনে দাঁড়িয়ে ছবি আঁকছে, দূরে একটা টেবিলের ওপর নানা ফল পরিপাটি করে সাজানো, তাতে গোটাকয়েক সিঙাপুরী কলার প্রাধান্যটা নজরে পড়ে। দিন কয়েক থেকে মন্দার ছবি-আঁকার ঝোঁকটা বেড়েছিলো।

আঁকতে-আঁকতে মন্দা গুনগুন করে গাইছিলো, কিতনকে বেচবে বালা ও বালা যৌবনওয়া। আড়চোখে অশোককে দেখে মুচকি হেসে তুলি চালাতে চালাতে সে বললে, ও অশোকবাবু, কিছু সওদা করবে নাকি? সকালের হাটের প্রথম পসরা, কেনোনা সস্তায় পাবে! ঘরে তো বৃদ্ধা রোগিনী! এ একেবারে টলটলে বালা যৌবন গোয়িং ফর এ সঙ। যা বলো, বালা যৌবনের আর এ-কালে আদর নেই যেমন বৃন্দাবনে ছিলো। তার হাসিতে ভুবন ভরে গেলো।

অশোকও হাসলে, কিছু বললে না।

তুমি কোনো কাজের নও। কথা কয়ে সুখ নেই তোমার সঙ্গে! এসো, ওই মোড়াটা টেনে নাও।

বাঃ বাঃ বৌদি। কলাবতী বটে আপনি! ছবি আঁকা যে কলা তা আজ বুঝলুম।

দেখো, ঠাট্টা কোরোনা বলছি। তেলের রঙ আয়ত্ত করছি একটু।

কিন্তু কলা দেখে যে লোভ হচ্ছে বৌদি?

তামার যে-কলায় লোভ হওয়া উচিৎ সে এ-কলা নয়, এ-কলা নয়। ন্দা মাথা দুলিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠলো। যে জীবের যা ধর্ম, কি ালো অশোক! ওদিকে আর ও-রকম করে চেয়ে থেকোনা! তুমি রাক্কস তা জানি। একটা সাবধানে তুলে নাও, বেশি নিওনা।

কলা খেতে খেতে অশোক বললে, বাঙালীর মেয়ের কি সংযম বৌদি, অবাক হয়ে যাই। সামনে কলা, বোকার মতো সেটাকে আঁকবে, খাবে না। ভাঁড়ারে কতো খাবার জিনিস, ঘাঁটবে তবুও মুখে দেবেনা কিছু। আচ্ছা ঠাকুর, বকিওনা, একটু মন দিতে দাও। তুমি এলে এমনিতেই তো মন ছড়িয়ে পড়ে।

অশোক কিন্তু ইজেলের গায়ে হাত রেখে কাছে দাঁড়িয়ে বাক্যব্যয় করতে লাগলো। মন্দার হাতে সিঁদুর রঙের তুলি, সে একটা আপেলে রঙ লাগাচ্ছিলো। তুলি উঁচিয়ে বললে, দেখো ভালো হবেনা বলছি, দেবো কপালে লাগিয়ে, মিনি দূর করে দেবে, বলবে—'কাল নিশি বলো কোথা গিয়েছিলে, সিঁন্দূর ভালে কে তব দিলে?' বাঁ হাতে মুখে আঁচল টেনে দৃষ্টিতে মধুক্ষরণ করে মন্দা হেসে উঠলো। চন্দ্রাবলীর দায়ে মারা যাবে তুমি, আমার এলিবিতে মিনিকে ঠেকাতে পারবে না। মিনি হয়তো বলবে, ওই মন্দাকিনী পোড়ারমুখীই তোমার চন্দ্রাবলী। ও অশোক, বলবে নাকি?

অশোক হাসছিলো। মন্দা মৃদু তীক্ষ্ণস্বরে বললে, উনি যে বাড়িতে, না হলে দিতুম রঙ লাগিয়ে; দেখতুম তোমার মুখের দশা! তার চোখ বিজলী হেনে গেলো।

অশোক এবার বসতে গিয়ে দেয়ালে ঠেস দেওয়া একটা ক্যানভাস আবিষ্কার করলে। উল্টে দেখলে সেটা গেরুয়া রঙ মাখানো পাগড়ি-পরা কোনো ব্যক্তির আদল। জিগগেস করলে, ইনি কিনি বৌদি ?

ওই জন্যই তো তেলের রঙ অভ্যাস করছি। ওটা বিবেকানন্দের ফাউনডেশন।

অশোক ক্যানভ্যাসটা নামিয়ে রেখে হাত জোড় করে বললে, বিবেকানন্দ ঠাকুর অবনতের ভূ-ভার মাথায় নিয়ে অনেক দুঃখ পেয়ে গেছেন। আর তাঁর দুঃখ লজ্জা বাড়াবেন না বৌদি, লক্ষীটি !

তুলি বোলাতে-বোলাতে এদিকে না চেয়ে মন্দা জিগগেস করলে, তোমার এ-সন্দেহের কারণ ?

কি জানি শেষে কার চোখ দেবেন ওঁকে ? তার চেয়ে যতোটুকু এঁকেছেন তাই থাক, আমি লোকসমাজে বলে বেড়াবো ওটা আমার কলাবতী বৌদির ফিউচারিস্ট কলা, যে যা পারো ভেবে নাও, আপত্তি হবেনা। সাধু ভাবো, ডাকাত ভাবো, শিখ ডোগরা যা ইচ্ছে ভাবো, এমন কি কাবুলীওয়ালাও ভাবতে পারো।

হঠাৎ সৌরভ পাচ্চি যে অশোক ! এতোদিন তো এসব ছিলোনা, তোমার হোলো কি ? কিন্তু ফিউচারিস্ট কারে কও ?

তা অবজ্ঞা আমাকে করতে পারেন আপনি ! আমি রাম-ফিলিস্টাইন, জানিনে কিছুই। গান শুনি, কানে যা ভালো লাগে তাকে ভালো বলি আমি সুরের বেলায় অসুর, তালতলা দিয়ে ভয়ে হাঁটিনে। ছবিকে ভালো

বলি যা চোখে ভালো লাগে। দেহসৌন্দর্য দেখলেই আমি খুশি। বইও সব যোগাড় করে রেখেছি সেই রকম।

রেখেছো নাকি? দিওতো একদিন।

অশোক মন্দাকে বই দিয়েছিলো। ভিনসের সকল কল্পনা যেটায় সেটা দিতে তার লজ্জা করেছিলো। যেটা দিলে তাতে পুরুষমূর্তি বেশি—ফারনিস্ হরকিউলিস্, অ্যাপলো, মার্করী। স্ত্রীমূর্তিও ছিলো—ভিনস্ ক্যালিপিগ, লা সোর্স ইত্যাদি।

কয়েকদিন পরে মন্দা বললে, তোমার বইটা নিয়ে যাও অশোক। ঘর থেকে বইটা এনে সে বারান্দার চৌকিতে বসলো! আনমনে যেন পাতা উল্টাতে উল্টাতে যে ছবিটায় এসে থামলো সেটা 'লেডা অ্যান্ড দি সোয়ন'। লেডাকে জুপিটর ভালোবেসেছিলো, কিন্তু কোনো প্রতিদান পায়নি সে ভালোবাসার। একদিন লেডা এক ফুলবীথিকায় ঘুমিয়ে পড়েছিলো। জুপিটর রাজহংসের আকার ধরে চুপি চুপি এলো। ছবিতে চিত্রকর কল্পনা করেছে দীর্ঘগ্রীব হংসবেশী জুপিটরের চঞ্চু উলঙ্গ লেডার নিটোল পূর্ণায়ত স্তনদ্ধুটির মাঝে স্থাপিত রয়েছে। মন্দা চকিতে লেডার বুকে আঙুল বুলিয়ে তার যৌবনশ্রীর ইঙ্গিত করে বইটা সশব্দে বন্ধ করে অশোকের দিকে ফেলে দিলে। অশোক মাথা নিচু করে নিয়েছিলো, না হলে দেখতে পেতো মন্দার চোখে চমক, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত, প্রশ্বাস হঠাৎ দ্রুত হয়ে উঠেছে।

কল্পকাল পরে যেন মন্দা জিগগেস করলে, ও অশোক, দেবতাদের হিংসা করো নাকি? আচ্ছা বলোতো, এই রাজহংসটি সুখী, না,

কালিদাসের পত্রবাহক রাজহংসের সুখ বেশি? খিলখিল করে হেসে উঠে মন্দা হাত উল্‌টিয়ে মুখ চাপা দিলে। তার হাতের চুড়ি বাজলো অশোকের হৃদ্‌স্পন্দনের ছন্দে। সে ছন্দ মাতাল।

আচ্ছা, তোমার যদি তিরস্করণী বিদ্যা থাকতো, বাতাস হয়ে মিলিয়ে গিয়ে সব দেখতে পেতে, সর্বত্র তোমার গতি থাকতো, কি করতে বলোনা? ও অশোক বলোনা? অশোক তখন আচ্ছন্ন মুহ্যমান। তার কানে এলো ভারি ধরা গলার মধুর মদির মৃদুস্বর, আমি তাহলে লজ্জা রাখতে পারতুম কি?

অন্ধকার হয়ে গেলো পৃথিবী, অশোকের বাহ্যচেতনা লুপ্ত হোলো। অনেকক্ষণ পরে যেন বেয়ারা এসে বললে, মেমসাব গুশলখানায় গেছেন, আপনি বসবেন কি?

যাবার ইঙ্গিত পেয়ে অশোক বই নিয়ে উঠে এলো। দুপুরে অনুভব করলে মিনি সেই দারুময়, প্রতিক্রিয়া নেই কোনো, রস নেই বিন্দুমাত্র, কঠিন তার স্পর্শ।

গাড়ি হরদোই স্টেশনে এসে দাঁড়ালো। আঁধার রাত্রি। ঘরের গাড়িতে বসে অশোক মন্দাকে মনে করে ভাবলে, দুইবিন্দু আকাশ তোমার চাহনিতে, তোমার নিশ্বাসে জীবন দুলে ওঠে, তোমার আলিঙ্গনে বুঝি বা মরণের ফাঁস জড়ানো!



পোনেরো

তখন শীতকাল। মন্দা একটা ছোটো বিচিত্র জামিয়ার মুড়ি দিয়ে তার নিভৃত বারান্দায় রোদে পিঠ রেখে বসে সেলাই করছিলো। প্রমোদ নেই, সকালবেলাতেই সে একটা কমিশনে কোন একটা তহসীলে গিয়েছে। তাকে অশোকের দরকার ছিলোনা অবশ্য। অশোক মন্দার কাছাকাছি বসে বললে, ও বৌদি, খলিফা নিয়ামৎউল্লাকে আপাততঃ ছুটি দিন, অনেক কথা বলবার আছে। আপনার সেলাই-কলের শব্দে এখানে আসবার আগেই কান ঝালাপালা হয়ে গিয়েছে।

মন্দা তার মুখের দিকে চেয়েছিলো, কলটা সরিয়ে রেখে দুহাতের পাতা উল্‌টিয়ে বললে, অব ফরমাইয়ে জনাব! কিন্তু দাঁড়াও, তার আগে একটু গরম জলের ব্যবস্থা করা যাক; আজ ভারি শীত। কি খাবে বলো? এসো আজ মাদ্রাজীদের মতো গেলাশে করে এক পুকুর কফি খাওয়া যাক। পাঁচ মিনিটে বেয়ারা কফি নিয়ে এলো।

অশোক বললে, প্রথমটা অতিশয় দুসংবাদ, মিনি যাচ্চেন চক্ষুওয়ালা। আমার তাঁকে পৌঁছে দেওয়া ছাড়া এক মিনিট কাছে থাকবার হুকুম নেই।

মন্দা ঠোঁট কুঞ্চিত করলে।

ও ওষ্ঠভঙ্গীর মানে?

মন্দা হেসে ফেললে, উত্তর দিলে, আজকাল আমার কৃপায় তোমার বুদ্ধি খুলেছে অশোক। মানে একটা আছে বৈকি। মিনির অপগণ্ড স্বামীটিকে সামলাবে কে শুনি ?

ভগবান আমাকে পরস্ত্রী-ধনে ধনী করেছেন বৌদি, আমার ভয় কোথায় ?

ভারি মজায় আছো, নয়? পরস্ত্রীর আর তোমাকে নিয়ে একদম পোষাচ্চেনা। ভারি ফাঁকি দাও তুমি! মিনি চলে গেলে তুমি আর আমার ছায়া মাড়াবেনা তা জানি। কিন্তু সে পোড়ারমুখীই বা যায় কেন ? আজকাল তো একটু ভালোই আছে!

সম্পূর্ণ ভালো হবার দরকার, তাছাড়া তাঁর প্রিভিলেজ লীভ পাওনা হয়েছে শুনছি। কিন্তু আরো কথা আছে। আমিও চললুম কলকাতায় মাস দু-তিনের জন্য।

মন্দা আগ্রহের স্বরে প্রশ্ন করলে, সেকি ? তুমি আবার শুধু শুধু কেন যেতে গেলে ?

শুনুন তাহলে। বাবা পরশু ডাকলেন, বললেন, এবার আমি অবসর নেবো। তুমি লেখাপড়া শিখলে অন্য ব্যবস্থা করতুম। তা যেকালে শেখনি কোনো ব্যবসা করো। আলোচনা যা হোলো তাতে এই দাঁড়ালো, বাবা আমাকে ৩০,০০০৲ টাকা দেবেন। পাঁচ হাজার এক বছরের জীবন-ধারণের পুঁজি, বাকিটা লাগবে ব্যবসায়। বাবা মা কাশীবাসী হবেন, আর সংসারে লিপ্ত থাকবেন না। ব্যবসা হবে বোধ হয় ছাপাখানা কিংবা রেশম-বোনার কারবার। বাবার প্রথমটায় ঝোঁক বেশি। আমাদের কোন এক আত্মীয় ওই ব্যবসায় নাকি নিযুতপতি হয়েছে। আপনি কি বলেন ?

ব্যবসার নামে আমি ভয় পাই অশোক। কিন্তু তবুও বলবো নিজে শ্রীঅর্জন করার চেয়েও বড়ো কথা আর নেই। বাপের নামে পরিচিত হবার চেয়ে নিজের শক্তির পরিচয়ই হাজার গুণে ভালো। সেই সত্যকার পরিচয়। কিন্তু তোমার ব্যবসার একি নমুনা, প্রথমেই মিনিকে কোপ দিচ্চো? তারপর তো আমার পালা!

আপনি জানলেন কি করে? এতো আমার মা'র প্ল্যান। কিছু বলেছেন নাকি তিনি?

মন্দা মৃদু হাসলে, কিছু বললে না।

মা বাবাকে বলছিলেন, বৌমা কিছুদিন দূরে থাক, না হলে ওর মন বসবে না। অশোকও হাসলো।

বাবাঃ, কি বেহায়া রকমের স্ত্রৈণ তুমি বলোতো? কবে যাবে কলকাতা, আমাকে নিয়ে যাবে?

যাবেন? সত্যি যাবেন বৌদি?

ফুটবলের বেলা "রমণীতে নাহি সাধ", জীবিকা উপায়ের বেলা ঘোড়ার ডিম, না? এখনো বলো, "রমণীতে নাহি সাধ, রণজয় গাওরে", কল্যাণ হবে তোমার!

অশোকের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো, আপনি কি আমার সাধ, বৌদি? সে মনে মনে জিভ কাটলো তৎক্ষণাৎ। কিন্তু কথাটা বলার সুখ অনবদ্য। অশোক চোখ ফেরালে।

মন্দা নিজের গালে আঙুল রাখলে, গালে টোল পড়লো; বিস্ময়ের স্বরে বললে, অবাক করলে তুমি! তাও আমি বলে দেবো? আমি তোমার

সাধ নই ? ও অশোক, বলোনা, আমি তোমার সাধ নই ? মন্দা উচ্ছ্বসিত হাসি হেসে উঠলো।

অশোক সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, এবার যাই বৌদি।

খবরদার বলছি। বসো। এখনি চক্ষুওয়ালা যাচ্ছো নাকি ? চা খাও, তারপর তোমার হাত দেখবো ব্যবসা-ভাগ্য কি ?

এসো, সরে এসো কাছে।

অশোক ডান হাতটি পেতে দিলে।

মন্দার নানা খেয়াল। দিনকয়েক কায়রোর বই নিয়ে সে মেতে উঠেছিলো। অশোকও পড়েছিলো বইটা কিন্তু মত্ত হবার মতো কোনো মধুর রস তাতে খুঁজে পায়নি সে।

হাতে-হাত। মন্দার মুখটি নিচু। সে আয়ত চোখ দুটি তুলে অশোকের দিকে চেয়ে চেয়ে হেসে উঠলো। মাথা দুলিয়ে বললে, যা করতে যাচ্ছো সে ব্যবসা তো তোমার নয়! প্রেমের বেসাতি যদি করতে কোটি কোটিপতি হতে তুমি !

তাই নাকি বৌদি ?

অশোকের বুড়ো আঙুলের নিচে মাংসল অংশটার মৃদু চাপ দিতে দিতে মন্দা বললে, প্রেমিক নও তুমি ? তোমার এই মাউণ্ট অব ভিনস্ যে কাঞ্চনজঙ্ঘাকেও হার মানায়! খুব ভালোবাসতে পারো, নয় ? বলোনা ? মন্দা চেয়ে দেখলে তার দিকে।

সাবাশ বৌদি। আমার হাত যে এমন বিশ্বাসহন্তা তা তো জানতুম না। দাঁড়াও গো ঠাকুর, দাঁড়াও, আরো আছে। তুমি কম পাত্তর নও তো দেখি! আচ্ছা, মিনি ছাড়া আর কোনো নারীর প্রভাব আছে তোমার ওপর? যা বলো, আছে কিন্তু। মন্দা অপরূপ ভঙ্গীতে মাথা দুলিয়ে হাসলে, কানের দুল তার ঝিকমিকিয়ে উঠলো। বলো না অশোক, কে সে নারী? সে অশোকের হাতে মৃদু চাপ দিলে।

অশোকও হাসলো, উত্তর দিলে, তার ঠিকানাটা দিন না বৌদি, খুঁজে আনি!

আনবে নাকি? মন্দা তার হস্তরেখা নিরীক্ষণ করতে করতে মাথা না তুলেই বললে, সে কি ব্যারিস্টর-বধূ, স্টেশন রোডে থাকে? বোধ হয় তাই। ঠিকানাটা টুকে নাও। কাগজ দেবো? না, বুকের নোট-বুকেই টুকবে?

সে গরঠিকানিয়া নয় বৌদি, চিনি তাকে, প্রভাবও মানি তার।

মানো? আবার বলোনা, ও অশোক। মানো? সে প্রভাব কি ন-ছাওয়া? দাঁড়াও, হাত টেনো না। ওমা, চা খেয়েছো তো অনেকক্ষণ! তোমার হাত ঘেমে উঠলো কেন?

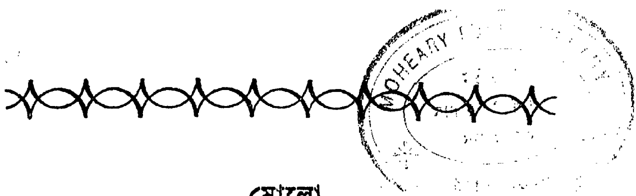
কি জানি।

বলবো?—বলি? কতো কামনা মনে লুকিয়ে রেখেছো অশোক? তোমার ভিয়া ল্যাসিভিয়ার খবর রাখো? কামনার রাজপথ যে তোমার হাতে আঁকা! এই যে!

অশোক জোর করে হাত টেনে নিলে।

মন্দা হেসে উঠলো, বিচিত্র হাসি। সে হাসিতে শব্দ আছে, হাসির রস নেই। সে নিজের হাতটা মেলিয়ে ধরে হস্তমূলে একটা চওড়া অর্ধবৃত্ত রেখার ওপর আঙুল বুলিয়ে দিয়ে বললে, এই দেখো, আমারো হাতে আছে ভিয়া ল্যাসিভিয়া—গভীর হয়েই আছে অগ্নিগর্ভ গিরির বাহ্যিক ইঙ্গিত। কায়রোকে জিগগেস করবো রেখাটার অর্থ আর ইঙ্গিত কি সত্যি? খপ করে বাঁ হাত দিয়ে অশোকের হাত টেনে নিজের হাতে রেখে বললে, অনুভব করে দেখো মাউণ্ট অব ভিনস্ আমারো হাতে সুপুষ্ট হয়ে আছে। নেই? বলো না?

দেহে কোটি কোটি রোমকূপ যে আছে, রোমকূপের শিহরণ জাগরণ যে শুধু কবিকল্পনা নয় অশোক উর্ধ্বশ্বাসে যেতে যেতে তা নির্মমভাবে অনুভব করলে।



ষোলো

রেশম-বোনার ব্যবসাটা শেষ পর্যন্ত আর অশোকের মনঃপুত হোলো না। ছাপাখানার ওপর ওদের বংশগত টান ছিল কারণ ওই ছাপাখানা দিয়ে অশোকের ছোট ঠাকুর্দামশায় বিপুল বিত্তের বনেদ করে গিয়েছিলেন, তাঁর বংশধরদের ধনের অবধি ছিল না। হরিহরপ্রসাদও সেইদিকে ঝুঁকলেন আর অশোক আব্বাস খাঁ ও য়াসীন মিঞার দল নিয়ে ছাপাখানা ফাঁদলো।

ভবিতব্যকে মানো আর না মানো, ভাগ্যলিপিতে অবশ্যম্ভাবীর লিখন আছেই। সেই অনাগতের পদচিহ্ন ভাগ্যলিপিতে বাল্যকাল থেকে আঁকা হয়ে যায় আর অমোঘ নিয়মে এই ভাগ্যলিপি অবশ্যম্ভাবীকে টেনে আনে, অতর্কিতে ধীরে ধীরে অবসানের দিকে—সে অবসান সফলতা বা বিফলতা যাই হোক না কেন। মানুষের বুদ্ধি আছে নিজেকে চালিত করবার, সে-বুদ্ধিকে শাণিত করে প্রয়োজনীয় খাতে ব্যবহার করবার জন্য শিক্ষারও প্রথা আছে, কিন্তু ভাগ্যই হোলো নিয়ামক। যার পুরুষকারে সৌভাগ্যের সংমিশ্রণ আছে সংসার তার ললাটে জয়তিলক এঁকে দেয়, যার নেই তার পুরুষকারও শেষ পর্যন্ত দুর্নিবার অপচয়ে মলিন অসাড় হয়ে যায়।

শতছিদ্র কলসীতে জল ভরেছিলো কেবল কলঙ্কিনী রাধা, আর কোনো

মানুষ সে অসম্ভবকে আর সম্ভব করতে পারেনি। অশোকের শাণিত বুদ্ধি অবশ্যই ছিলো এবং সে তার মধুকরবৃত্তি দিয়ে জীবন থেকে অনেক কিছু চয়ন করে নিজের মনে সঞ্চিত করে রেখেছিলো, এ ছাড়া তার মনের কলসীটি ছিল সহস্র ছিদ্রে ভরা। ব্যবসা করা মানে আবেগশূন্য রূঢ় বাস্তবজীবনের নিরাভরণ কঙ্কালটার সঙ্গে কেবল কারবার করা, সেটাকে সকল আবেষ্টনে চিনতে পারা। অশোক ব্যবসায়ের সন্ধান শিখতে কলকাতা গিয়েছিলো বটে, কিন্তু শেখাটা তার প্রকৃতিগুণে দাঁড়ালো চোখ দিয়ে ভাসাভাসা দেখা। যন্ত্রের সঙ্গে মানুষের কি সম্বন্ধ, কি করে অপর মানুষকে উপাদান করে যন্ত্রের ক্ষুধা মিটিয়ে নিতে হয়, সে গভীর উপলব্ধি—গভীর কেন, কোনো উপলব্ধি তার হয়নি। কে একজন যেন বিজ্ঞান বলে দৈত্য গড়েছিলো, কিন্তু সে দৈত্যের চির অতৃপ্ত ক্ষুধা মেটাবার পন্থাটি সে ভাবেনি। একদিন সে ক্ষুধা মেটাতে নিজেকেই তার বলি দিতে হয়েছিলো। মানুষের সৃষ্টি করা যন্ত্রও তাই, তাকে দিয়ে দাসত্ব করাতে গেলে চাই বলির আয়োজন, সে আয়োজন নিরন্তর, ছুটি নেই, শেষ নেই তার। এই চোখ দিয়ে দেখার প্রশস্ত অবসরে অশোকের প্রবাস কেটেছিলো মিনি আর মন্দাকে চিঠি লিখে লিখে। সে বিচিত্র রসে আর মুদ্রণ যন্ত্রের আঠালো কালিতে বিন্দুমাত্র ঐক্য নেই। অর্থোপার্জন করতে গেলে প্রথম দরকার অর্থকে রক্তমাংসের স্বকীয়া বা পরকীয়া প্রিয়তমার চেয়েও নিবিড়তর করে ভালোবাসা—স্বকীয়া নয়, পরকীয়ার মতোই বিমুগ্ধ অন্তর দিয়ে, রোমাঞ্চকর করে ভালোবাসা। নিছক জীবিকার প্রয়োজন ছাপিয়ে বড়ো পুঁজির লক্ষ্যসাধন করতে গেলে

ছোট বড়ো পাপ, পেষণ, মানবাত্মার বিরুদ্ধে অনেক অপরাধের বিষয়ে দরকার কায়মনোবাক্যে অসাড়তা লাভ করা। বিবেকের বা নীতির দ্বিধা আছে যার তার স্থান নেই এ বিত্তের জগতে। এ প্রয়োজনের জন্য কেউ কেউ বাল্যকাল থেকে যেন আপনি গড়ে ওঠে বিধিলিপির তাগিদে, আর যারা ওই আবহাওয়ার ভেতর জন্মগ্রহণ করে তারা সহজেই ওই ছাঁচে ঢালা হয়ে যায়।

অশোকের এ গুণ বা অবগুণ ছিলো না। বরং হরিহরপ্রসাদ তার মনে উল্টো একটা ভিত্তি রোপণ করেছিলেন। তিনি অশোককে প্রায়ই বলতেন, মানুষ প্রথম যৌবনে কিছু টাকা না ওড়ালে উদার চরিত্র হয় না। শুধু মুখের কথা বলা নয়, একদিন তিনি তার হাতে দু'হাজার টাকার একখানা চেক্ দিয়ে বলেছিলেন, এটা তোমার যা ইচ্ছে করতে পারো। এর হিসাবী কোনো খরচ হওয়া উচিত নয়। সেই টাকাটাকে অশোক ভালোবাসতে পারলে তার জীবনের অভিব্যক্তি ভিন্ন রূপ ধারণ করতো। সে গর-হিসাবি মনে কিছু বই কিনেছিলো, শ'পাঁচেক টাকার সেণ্ট মাখিয়েছিলো মিনিকে। বাকিটার পক্ষোদ্ভেদের কথা তার স্মরণ ছিলো না। বিয়ে হবার পর থেকে সে মাসিক একশো টাকা করে হাত-খরচ পেতো। কিছু নিতো কুস্তিশিক্ষক খলিফা, ডনোহিউ মাইনে নিতো না, উপহার নিতো, বাকিটার কোনো হিসাব থাকতো না। অশোক একদিন কবি মিল্টনের জীবনী পড়ে উল্লসিত হয়ে মাকে কথাটার অর্থ আর ইঙ্গিত বুঝিয়েছিলো—*"Even at the age of 32 Milton had not earned a penny"*—আর বলেছিলো, আমার তো মোটে

ছাব্বিশ বছর হলো মা! কথাটা হরিহরপ্রসাদের কানে গিয়েছিলো। তাঁর লক্ষণজ্ঞান থাকলে আর যাই হোক অশোককে তিনি ব্যবসা করতে দিতেন না।

বিধিলিপি পথ বাঁধছিলো। অশোক লক্ষ্ণৌএর এক নিলামে অনেক পুরানো যন্ত্রপাতি কিনলে, নূতন কিনলে যৎসামান্য, কিন্তু ব্যবসার পুঁজিটি শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত নিঃশেষ করে। তার এ চৈতন্য ছিলোনা যে ব্যবসা করতে গেলে কিছু দ্রব পুঁজির নিত্য দরকার থাকে। হরিহরপ্রসাদ তখনো কাশীবাসী হননি, তিনিও এ ভুলটা সামলাতে পারেননি কারণ এ-তথ্যটা তাঁরও জানা ছিলোনা।

যাহোক, একদিন অশোকের যন্ত্রালয়ের প্রতিষ্ঠাপূজা হোলো। মিনি নৈবেদ্য সাজালো, অশোকের মা যন্ত্রগুলিকে সিঁন্দুরচর্চিত করলেন। মিনি যন্ত্রপাতির মাঝে নিজের স্বামীকে দেখে কি ভাবলো সেই জানে। মন্দাও উপস্থিত ছিলো এ প্রতিষ্ঠাপূজায়। সে অশোকের পানে নির্নিমেষে চেয়েছিলো আর মানশ্চক্ষে দেখছিলো তার বর্দ্ধিতশ্রী, দেখছিলো তার সংসারক্ষেত্রে প্রথম পদার্পণের পুরুষকারের প্রসার।

পূজাশেষে মন্দা মিনির সঙ্গে ফিরে গেলো। তাকে নিভৃতে আলিঙ্গন করে মন্দা বললে, মিনি ভাই, অশোক আজ তোর হয়ে গেলো সম্পূর্ণভাবে। এ ভিন্ন লোক, এখানে তার সহায় একমাত্র তুই। গোড়া তোর হাতে, নির্ভর তোর পায়ে, সাহস তোর চোখে। ওর জীবনের কেন্দ্র রইলো তোর অধিকারে। আমার মতো বাহু যারা তারা শুধু ভাঙে, গড়ে না; জড়ো করেনা, ছড়িয়ে দেয়। তুই তাকে রক্ষা করিস।

মন্দার চোখে জলের আভাস, ওষ্ঠে আবেগের মৃদু কম্পন, মিনি দেখে অবাক হোলো। মুখে বললে, বুঝলুম না কিছু দিদি, একেই তোমার কথা কোনোদিন বুঝিনি। কি বলছ, সোজা সহজ করে বলো না!

বলবো? না থাক। ওর বেশি বলতে নেই।

রাত্রে মন্দার কাছে অশোকের নিমন্ত্রণ ছিলো। খাওয়া শেষে একা হতেই মন্দা জিগগেস করলে, মেয়েমানুষের সকল ইচ্ছা বোঝ অশোক?

ওরে বাবা, দেবতায় পারেননি, কুতো ছার মনুষ্য!

দেবভাষাটার পিতৃশ্রাদ্ধ আর করোনা। বুঝতে চেষ্টা করলে বোঝা যায় বৈকি। মিনিকে দিয়ে তো আর বুঝতে চাওনি! তাহলে বুঝতে প্রিয়া শুধু প্রিয়া নয়, সচিব সখি ভগ্নি আরো কতো কি। ইংরেজে স্ত্রীকে 'মদর' বলে, তোমরা শিউরে ওঠো। কিন্তু ওটাও সত্যি যদি সে পূজার, অপরিমিত প্রেমের নিবিড় ক্ষণটি উপলব্ধি করতে পারো।

আবার হেঁয়ালি বৌদি! এ ভূরিভোজনের পর আমার বদহজম হবে।

বলোনা অশোক! আমি তো তোমার সাধ। নয়? তুমিই তো বলেছিলে ও-কথা একদিন। এ ক্ষণে আর আমি সাধ নই, অন্য কিছু। তা পারো বুঝে নিও। মাথা কাছে আনো, তোমার মাথায় হাত রাখবো।

অশোক বিস্মিত হোলো। তার বুকে আঘাত করলে একটা অনির্দিষ্ট অনুভূতি, কিন্তু মাথাটি পেতে দিলে। মন্দা দুটি করপল্লব রাখলে তার মাথায়, প্রিয়ার করপল্লব নয়, এ শুভকামনার স্পর্শ অন্য কোনো স্নেহময়ীর। সে মনে মনে বললে, আমার কাছ থেকে তোমাকে যেন রক্ষা করতে পারি, নিজের অনলে আমি পুড়ি ক্ষতি নেই।

মন্দার এ-মন বোঝার অশোকের প্রয়োজন ছিলো না, ক্ষমতাও ছিলো না। কেই বা বোঝে চঞ্চলচিত্ত নারীর মন! সে কেবল শুভার্থিনীর এই নিবিড় স্পর্শটুকু, তার শুভকামনাটুকু বুঝে প্রীত হোলো। তারপর সে ডুব দিলে নিজের কাজে, কর্মঠ উৎসাহে তলিয়ে গেলো। ওদিকে তাদের অতো বড়ো বাড়িটায় মিনি হোলো একলা। কিন্তু ছোট্ট মিনি হঠাৎ গৃহিনীপদ পেয়ে বাড়ির ভিতরে বাহিরে ব্যপ্ত হয়ে গেলো। গৃহে অশোকের স্থানটা হোলো গৌণ।

নিয়মিত বৈকালিক টেনিস নৈমিত্তিক হোলো। মন্দার টেনিসের যা নেশা তা বেণীর দ্বারা এবং কখনো কখনো ক্লাবের অন্য কারো দ্বারা মিটতে লাগলো। কিন্তু সেটা টেনিসই—শারীরিক ব্যায়াম, মাধুর্যসঙ্গত মনমাতানো ক্রীড়া নয়। মন্দা সময়ে সময়ে ভাবতো, ছেড়েই দি। কিন্তু বিকেলবেলার একটা ঘরে অতিষ্ঠ করার খোঁচা ছিলো। এক একদিন সে আর থাকতে পারতো না, অশোকের কাছে চিঠি পাঠাতো, আজ আসবে? আসনি তো অনেক দিন! একালে খেলাই তো মৃগয়া, তোমার কি আর সে মৃগয়ার দরকার নেই? কিন্তু আমার যে অন্তর-ছাপানো তাগিদ রয়েছে তোমার ডবল্‌সের ঘর-করণা করবার! ও অশোক, এসো না!

অশোক আসতো। এ মিনতিকে অবহেলা করা দুঃসাধ্য শুধু নয়, তার মনেও বিকেল বেলার সাড়া ছিলো প্রখর হয়ে, কিন্তু দায়িত্বের অবরোধ ছিলো।

রাত্রে মিনি পড়ার ঘরের পর্দা তুলে দেখতো অশোক স্তূপাকার

কাগজপত্র নিয়ে মগ্ন। চুপি চুপি পর্দা ফেলে দিয়ে সে ফিরে যেতো, উপলব্ধি করতো পুরুষের এ চিত্তদুর্গে নারীর প্রবেশাধিকার নেই, আর নেই এ কাজ-তপস্যায় তপোভঙ্গ করবার শক্তি। অশোক মিনির প্রভাত বেলার আলুথালু শিথিল কবরী দেখতে ভালোবাসতো, সে কবরীমূল কতো প্রগাঢ় চুম্বনের আদর পেয়েছে, মিনি কবরীশাসন করতে শিখলে।

একদিন মন্দা রঞ্জুকে স্নান করাচ্ছিলো। সে এখন পাঁচ বছরেরটি, হৃষ্টপুষ্ট অতীব প্রিয়দর্শন শিশু। ছেলেকে দেখে দেখে মন্দা কি ভাবলে সেই জানে, বললে, খোকা, অশোকের মতো হতে পারিস ?

খোকা বললে, হাঁ মম্‌সি।

তার নধর কোমল বাহু স্কন্ধে হাত বুলিয়ে দিয়ে মন্দা বললে, হবে তোর অশোকের মতো শালবৃক্ষলাঞ্ছন বাহু ? বলনা খোকা ! বুকে হাত রাখলে, হবে কি তোর তার মতো কবাটবক্ষ ? হ্যাঁরে খোকা, তুই কি অশোকের মতো সিংহগ্রীব সিংহ-কটি হবি ?

মা'র হাত বুলানোয় রঞ্জুর গায়ে সুড়সুড়ি লাগলো, সে খিলখিল করে হেসে উঠলো কিন্তু জবাব দিলে, হম আছোবাবু হায় মমী !

রঞ্জুর উরুতে যেন এক মল্লরত ব্যক্তির বিশাল বিস্ময়কর পেশী-বিভাজিত উরুর আভাস ; সে দৃশ্য মন্দা ভুলতে পারেনি। সে হঠাৎ জলসিক্তদেহ রঞ্জুকে বুকে চেপে ধরে অকারণে তাকে অজস্র চুম্বন করলে। রঞ্জু ডার্লিং, ফুটবল খেলবি ? এ প্রস্তাবে ছেলে আনন্দে

আত্মহারা হয়ে লাফিয়ে উঠলো, উত্তর দিলে আদরের সুরে, দেও মমী, ফুটবল দেও। কব দেওগে ?

বেয়ারা সেই দ্বিপ্রহরেই একটা ফুটবল কিনে আনলে, আর অঙ্গনে মা-ছেলের খেলা আরম্ভ হয়ে গেলো। মা বল গড়িয়ে দেয় আর ছেলে তাতে লাথি মারে।

অশোক এলো সে রাত্রে। মন্দা জিগগেস করলে, বলোনা, ও অশোক! রঞ্জুকে বারবেল কিনে দিই? তোমার খলিফাকে রাখি ওকে কুস্তি লড়াতে ? তা বলে বক্সিং নয়, ছেলে আমার নাক থেঁতো করে কুৎসিত হয়ে যাবে। বলোনা, ও অশোক ?

অশোক মন্দার এ সকল বিচিত্র প্রস্তাব শুনে অনেকক্ষণ ধরে হাসলে। অবশেষে বললে, ও বৌদি, আপনি যে সত্যিই প্রহেলিকা আজ ভালো করে বুঝলুম। হঠাৎ ছেলেকে বীর বানাবার শখ হোলো কেন ?

সে তুমি বুঝবে না। বলোনা, কতোদিনে রঞ্জু তোমার মতো তিনমণ লোহা তুলতে পারবে ?

তাতারসি ফোটে শুষ্কহৃদয় মরুভূমিতে, সে কম্পমান বাষ্প পরিচয় দেয় ধরিত্রীর অসীম অতৃপ্ত তৃষ্ণার। অশোক কি মন্দার চোখে সেই তাতারসি দেখলে ? সে চোখ নিচু করলে।

মন্দা বললে, তুমি সায় দিচ্চো না যেকালে ও-কথা এখন থাক। তোমার কিছু কাজ আমায় দাও না! প্রুফ পড়ে দেবো, আর কিছু পারবো না যদিও। এতোদিনে তোমার জন্য হিন্দি বিদ্যেটা ঝালিয়ে নিয়েছি। দেবে ? বলোনা, দেবে ? মাইনে দিতে হবে না, ভয় নেই।

ওকি আপনার কাজ বৌদি! কেন অকারণে ও-ইন্দিবর নয়ন দুটির মাথা খাবেন? আচ্ছা, আচ্ছা, দেবো। চোখ দিয়েও যে মানুষ রাগ দেখাতে পারে তার সাক্ষী আপনি।

মন্দা চট করে মৃদু নিঃশ্বাসের স্বরে বললে, অনুরাগও ঠাকুর! সেইটাই যা তুমি দেখলে না।

ব.দিন পরে মন্দা একদা লিখে পাঠালে, ও অশোক, নূতন গান শিখেছি। কাকেই বা শোনাবো! কি শিখেছি জানো?—

'আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে,
মরিলো মরি।
ভেবেছিলাম ঘরে রব
যাবোনা বাহিরে
ওই যে বাজিল বাঁশি,
বল কি করি?'

কথাগুলো দিয়ে শুধু বিচার কোরোনা। ও গান গাওয়ার পেছনে এ বাঁশির ডাক শোনার মর্মান্তিক আকুলতা আছে, সেইটুকুই তো এ-গানের প্রাণ! কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য কি জানো? এ-গান ছড়িয়ে যায় ব্যর্থ আকাশে। আকাশের তো আর তোমার মতো মুগ্ধ হৃদয় নেই! কিন্তু আর যে ঘরে থাকতে পারছিনে! বলোনা, কি করি! ও অশোক, বলোনা, কি করি!

মন্দার চিঠি পড়ে আগেকার মতো আর অশোকের হৃদয় উষ্ণ হয়ে ওঠে না। নির্মম সংসারের কঠিন মাটিতে অনেক গহ্বর, সেগুলো যেন

সজীব আবর্ত, পথিককে নিয়ত আপনার অতলান্ত গভীরতায় নিবিড়ভাবে আকর্ষণ করে। অশোক সরস সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন, আবর্তের ঘূর্ণিপাকের সংসারই তার একমাত্র সত্য। আত্মরক্ষার পীড়াটাই তার সমগ্র চেতনায় ব্যাপ্ত। তার স্নায়ু, শিরা-ধমনী, হৃদয়মনের সকল শক্তি নিযুক্ত হয়ে আছে এই বিষম পীড়াটাকে ঠেকাতে।

অশোকের গাড়ির সহিস যেদিন ব্যয়সঙ্কোচের তাগিদে অবান্তর বলে গেলো, মিনি আড়ালে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলো! অমন যে মন্দা সে কিন্তু এ নূতন ভূমিকাপাত লক্ষ্য করেনি। পুরানো ছেঁড়া কাপড় পরা যায় কিন্তু সেলাইয়ের লজ্জার মতো নিবিড় আর কোনো লজ্জা বিশ্বসংসারে নেই। অশোকের বেশভূষার বিষম পারিপাট্য ছিলো। মন্দা কবি, দৃষ্টি তার দূর-বিসর্পী, কাছের জিনিস তার নয়নপথে পড়ে না। সে লক্ষ্যও করলে না যে অশোকের অঙ্গে আর চীফু সিল্ক ওঠে না, তার জুতো নিতান্ত দেশী—লোটস, স্ল্যাক্সোন, কে বা ওয়ক-ওভর নয়, যা আগে তার আঙ্গিক ছিলো। ওয়াজিদ অলি শাহের মতো অশোক স্ব-রাজ্য খুইয়ে ছিলো। ওয়াজিদ অলি খুইয়ে ছিলো বিলাসে, উড়িয়ে আর আলস্যে, আর অশোক খোয়াচ্ছিলো লক্ষ্মীর নিবিড় সেবায়, শ্রমে, সঙ্কল্পে একাগ্রতায়। নিজেকে মনে করবার সময় পেলেই তার অমোঘ রূপে মনে পড়তো—'লছমী চাহিতে দারিদ্র বেঢ়ল মাণিক হারায়ু হেলে।' বেড়াজাল যে কী তা অশোক তার দেহের প্রত্যেকটি রক্তকণিকা দিয়ে বুঝেছিলো। বুঝেছিলো এই প্রত্যেকটি রক্তকণিকা সে বেড়াজালের ফাঁসে ফাঁসে আক্রান্ত।

কি কাজে একদিন প্রমোদ তার গাড়িটা চেয়ে পাঠালো। গাড়িটা তখন অশোকের মোহের চিত্তসুখের পর্যায় পার হয়ে গিয়ে বাহ্যিক প্রয়োজনের দায়ে এসে ঠেকেছে। হরদোই শহরে এ গাড়ির আর বিপুলকায় চিক্কণ-দেহ তুষারশুভ্র ওয়েলর ঘোড়াটার খ্যাতি ছিলো, মান ছিলো। ঘোড়াটারও ছিলো বরসজ্জা। গাড়ির বিবর্ণ চটা-ওঠা রং, পিতলের অংশগুলো পালিশবিহনে ম্লান, পালিশবিহীন সাজে রাস্তার মুচির নোংরা মেরামতী হাত পড়েছে। ঘোড়াটা পাঁজর বার করা শ্যামাভ হয়ে গেছে। কোচওয়ানের অঙ্গে আর মেণ্টন বনাতের উর্দি নেই, তার নিজস্ব মলিন বাস তার দেহে। প্রমোদ অশোককে আড়ালে পেয়ে বললে, কুইট্ নাও বিফোর ইট্স্ টু লেট্। দি অটর ডেপথ্ ইজ গেপিং এ্যাট্ য়ূ। এই হাঁ-করা ক্ষুধিত গহ্বরটাকে প্রমোদ ভালো করেই জানতো, তার ভয় যে কি নিদারুণ তাও তার অবিদিত ছিলো না।

অশোক মাথা নিচু করে উত্তর দিলে, তা হয় না প্রমোদদা, দি ব্যাট্ল্ ইজ থিক্, এখন পালানো যায় না। পুরুষে-পুরুষে আলাপ, এইখানেই পুরুষের আশ্রয় আর বোধহয় শান্তি। মন্দা এ ইঙ্গিত করলে মর্মান্তিক হতো, অসহ্য লজ্জা অপমানের কারণ হতো।

যে লোকটা বলেছিলো 'ইফ ওয়েল্থ্ ইজ্ লস্ট নথিং ইজ লস্ট', বিশ্বসংসারে তার মতো বোকা আর বোধ করি ছিলো না। সে কোনো কালে উপলব্ধি করেনি পুরুষের শ্রী কি। ধন তো শ্রীরই পাদপীঠ! ধন পরিমিত হতে পারে কিন্তু সেইটুকুর ওপর নির্ভর শ্রীর পরিমিতি নেই। ঐশ্বর্য ধনাতিরিক্ত বস্তু, অপরিমিত ধনীতেও তা লাভ করেনা,

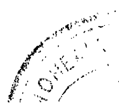
কিন্তু যে করে, শ্রীর ভিত্তি তার অটুট। শ্রী আর শ্রেণী পুরুষের বিজয়রথের দুটি অশ্ব। অশোকের বাপের টাকায় গড়া শ্রী আর শ্রেণী ছিলো না, সে টাকা তো অল্পই—হাজারের মাপের। বায়োলজি তাকে শ্রেণী দিয়েছিলো, শ্রীসম্পন্ন করেছিলো তার ললাটের লিখন করে। অশোকের দেহ রইলো, শক্তি রইলো, অটুট স্বাস্থ্য রইলো কিন্তু শ্রীতে ভাঙন ধরলো। এবং যেদিন সে উপলব্ধি করলে তার ইতরশ্রেণীর কর্মচারীরা তার সঙ্গে ডেকে কথা কয়, এমনকি কথা কাটাকাটি করবার চেষ্টাও করে সেদিন অশোকের সম্যক মৃত্যু হোলো।

পুরুষের সব চেয়েও বড়ো ধিক্কারের কথা, এ-মৃত্যুর পরও নিছক বাঁচার প্রয়োজনে তার দেহ বেঁচে থাকে। মিনি কেবল রইলো অশোকের এই নিদারুণ শোকাবহ বেঁচে থাকার সাক্ষী হয়ে। সে এখন বুঝতে শিখেছিলো। সন্ধ্যায় বা রাত্রে ঘরে ফিরে অশোক মিনিকে দেখতে পেতো প্রসাধন-চারু মিনি, মুখে তার সহায়ের মৃদু মিষ্ট হাসি, চুড়ির শিঞ্জনও তার সজীব। কিন্তু দেখতে পেতো না মিনি সংসারের তাপে ঝলসানো—রৌদ্রতাপে ঝলসানো ফুলের চেয়েও করুণ। আর দেখতে পেতো না দিনের বেলার মিনিকে, যার কুৎসিত ম্লান অঙ্গবাসে জোড়াতালি, দৈনন্দিন সংসারে জোড়াতালি দিয়ে মুখরক্ষা করতে যে নিরলস, সদা-জাগ্রত দেবতার মতো। যে সহায় খোঁজা প্রিয়ার, পরকীয়া যাতে বাহ্যই থেকে যায় প্রিয়ার অপ্রকৃত ক্ষণস্থায়ী রূপান্তর বলে।

নিরাপত্তা-বোধ তার ছিলো না একটুও কিন্তু মিনি মুখ বুজিয়ে

থাকতো, অশোককে কোনো প্রশ্ন করতো না পাছে পাতাল ফুঁড়ে সহস্র বিষধর নাগিনী বেরিয়ে পড়ে। অশোকের মলিনতা দেখে প্রায়ই তার চোখে জল আসতো, কিন্তু সে কান্না রোধ করতো। অশোকের মন সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলো। গাড়ি চেপে, অনেকগুলি লোকের অন্নদাতা হয়েও এ-মুখরক্ষা করার বিষম গ্লানি তার অন্তরে আর প্রবেশ করতো না! কারখানা থেকে কিছু নিতে তার বাধতো। গোড়াকার পঞ্চাশজন কর্মচারী তখন কুড়িজনে দাঁড়িয়েছে। অশোকের মনে হতো, নেওয়া নয়, তাদের মুখের গ্রাস চুরি করা। অন্য চুরি না হোক নৈতিক চ্যুতি যে তার ঘটেনি এমন নয়। কিন্তু মৃতের আবার নীতি কি? এ-চুরি কিন্তু তার সহ্য হতো না তখনো মনে ভদ্রয়ানা কিছু অবশিষ্ট ছিলো বলে।

রাত্রে মিনি অশোকের খাটে এসে বসতো। তার পায়ে হাত বুলিয়ে দেবার কিম্বা গল্প ফাঁদবার চেষ্টা করলে অশোক বলতো, শুয়ে পড়োগে মিন্টি, আজ থাক। বলতো না, কাল এসো। রমণীতে সাধ তার চুকে গিয়েছিলো। রণজয়ের গান গাইতে রমণীর সাধ চোকানো নয়, এ সকল সাধের সাগর শুকিয়ে যাওয়া, চুকিয়ে দেওয়া রসের দাবীদাওয়া।





আঠারো

মাত্র ছ'টি বৎসরে এই পরিবর্তন কিন্তু সেটা জীবনসঙ্গত সহজ কিছু নয়। শাস্ত্রবিদেরা বলে থাকেন, দেহের যে পরিবর্তনের ধর্ম তা ঘটতে লাগে পনেরোটি বৎসর ; অল্পে অল্পে দেহের প্রত্যেকটি কোষ, মেদ মজ্জা অস্থি সব নবীভূত হয়ে যায়, কিন্তু এ-বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মতো তাতে সাধ শুকিয়ে যায় না। জীবনধর্মের প্রেরণায় মানুষের মন যায় সাধ থেকে সাধান্তরে, অন্য সাধে—যা কেবল মূল্যের, তৃপ্তির, অনাগতের প্রতি কৌতূহলের পরিবর্তন। তাতে আছে সহজের মানুষপ্রকৃতির অভিব্যক্তি। আর অশোকের এ পরিবর্তন মৃত্যুর, অভিব্যক্তি নেই, গতি নেই তাতে, আছে শুধু জড়তা।

তাহলেও বীজের সম্যক মৃত্যু সহজ নয়তো! শুষ্ক মাটিতেও বীজ সুপ্ত থাকে, জীবনের ইঙ্গিত নিজের অন্তর্কোষে রক্ষা করে আর রসের আভাস স্পর্শ পেলে আবার অঙ্কুরিত হয়, আবার জীবনের চঞ্চল বার্তা আনে মাটির বুকে। অশোকের মনে বুঝি কোনো কোনো সাধের তখনো সুপ্ত বীজ ছিলো।

এক ছুটির দিনের বিকালে অশোক বাগানে পায়চারি করতে করতে ভাবছিলো তার বেড়াজালের নূতনতর কোনো ফাঁসের কথা। মিনি আর তার এ-পায়চারি করবার সাথী হয় না। কোনো এক কালে যে কেউ

নিত্য নিয়মিত তার খোঁপায় ফুল গুঁজে দিতো সে-কথা মিনি ভুলে গেছে কবে, অশোকও ভুলেছে সেই ফুল গুঁজে দেবার শোভা আর রোমাঞ্চ। আর মালী নেই, বাগান আগাছায় অপরিচ্ছন্নতায় ভরা। অশোক গোলাপ ক্ষেতের ধারে গিয়ে দাঁড়ালো। এক কালে তার এ-সখের উন্মাদনা ছিলো। মিনি বলতো, ওরা ফুল নয়তো, আমার সতীন! অশোককে গোলাপের পরিচর্যায় রত দেখলে সে মৃদু হেসে টিপ্পনী করতো, 'মুঝে দম দে কে সওতন ঘর যানা।' কোনো পথচারীর মুখের এই ভোগা দিয়ে সতীনের ঘরে যাবার গানটি তার শ্রুতিতে আটকে গিয়েছিলো। কিন্তু সেও হারিয়ে যেতো এই রূপবর্ণসুবাসের বিভ্রম-করা, উন্মাদনার রাজ্যে। অশোক তার খোঁপায় গুঁজে দিতো শট্ সিল্কের আধফোটা কুঁড়ি। মিনির গাল সে কুঁড়ির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লেগে যেতো বর্ণাঢ্যের শ্রেষ্ঠতা নিয়ে। অশোক বিমুগ্ধ হয়ে তার আনত মুখপানে চেয়ে বলতো, মিণ্টি, আমার শট্ সিল্ককে তুমি লজ্জা দিলে।

কতো যে মেয়ে গোলাপের দেশে! কেউ উষার রঙিন আলো, কেউ অস্তরবির বর্ণসম্ভারের কণা। কেউ আবেশ, কেউ বিহ্বলতা, কেউ বা সঘন প্যাশন। লেডা অশোকের চোখে ছবি ফোটাতো 'লেডা অ্যাণ্ড দি সোয়ন'-এর, কবি ভর্তৃহরির রূপসীশ্রেষ্ঠকে মনে করিয়ে দিতো— 'সুরতমৃদিতা বালবণিতা'—কেলি অবসানে ক্লান্ত, স্বল্প, মোহিনী বধূ। চৈতন্যচরিতামৃতের পদ মনে পড়ে যেতো, 'লীলা অন্তে সুখে ইঁহার যে অঙ্গের মাধুরী, তাহা দেখি সুখে আমি আপনা পাসরী।' ফুলকে বুক দিয়ে আলিঙ্গন করতে পারলে অশোক বোধ করি হিল্ডাকে আলিঙ্গন

করতো। প্রস্ফুটিত হিলুডা তাকে নিয়ে যেতো স্বপনের দেশে। অশোকের মনে হতো তার হিলুডা যেন এথেনার মন্দিরের বালা পূজারিনী, শিল্পী যাকে ভিনস্ দ্য মাইলোর আকার দিয়েও সম্পূর্ণ করে পায়নি। কোন শিল্পীই বা মনে ধরা রূপটিকে সম্পূর্ণ করে পায়! যা ধরতে পারে তা মানসপটে আঁকা রূপের কতোটুকুই বা! হিলুডার দিকে চেয়ে অশোক কল্পনার চোখে দেখতো, ভিনসের মর্মর মূর্তিটি যেন লজ্জারুনিমার আবেশে ছেয়ে গেলো; তার কর্ণে গণ্ডে কণ্ঠে স্তনে শিহরিত উর্মিজাগা চুচুকে ছড়িয়ে গেলো এই হিলুডার প্রাণমাতানো লালিমার বিচিত্র বর্ণ আলো ব্রীড়া, আর অনির্দিষ্ট কতো উপলব্ধির ছায়া যাকে মানুষ আজো ভাষা দিতে পারেনি, যা শুধু চেতনারই ধন।

ফাল্গুন মাস, গোলাপের নিবিড় যৌবনের কাল। অশোকের যত্নহীন, পরিচর্যাবিহীন ক্ষেতে অনেকে নেই। যারা আছে তারা যত্নের অভাবেও উদ্ভিন্নযৌবনা, ফুলে ফুলে ছাওয়া; যেন দরিদ্রের ঘরের নবযুবতীর অঙ্গে অবশ্যম্ভাবী বন্ধুর যৌবনের জোয়ার। কুঁড়ি আর ফোটা ফুলের দ্বন্দ্ব চারদিকে। হিলুডাতেও কুঁড়ি ধরেছে, আবরনী একটু খুলে গিয়ে উন্মুক্ত করে দিয়েছে রঙের ঈষৎ আভাস। অশোকে মন গুনগুনিয়ে উঠলো। সে কুঁড়ি সহ্য করতে পারতো না, কুঁড়ির নিরোধের বেদনা তাকে অস্থির আকুল করে দিতো। কোনো গাছে কুঁড়ি দেখলে তার দ্রুত পরিপুষ্টির জন্য সে অধীর হয়ে উঠতো, দিনের মধ্যে সহস্রবার গিয়ে দেখে আসতো এই গর্ভপূরণের পর ফুলটির জন্মের আর কতো দেরি। পুরানো দিনের মতো অশোক উল্লসিত হোলো, হিলুডার কোরককে আপনার মনে বললে,

পথ করে দে, পথ করে দে, পথ করে দে হৃদয় চিরে।

পিছনে তোর আসছে যে ফুল মুকুল তুই আর থাকবি কি রে।

ওপাশে এক শ্যামলিয়া মেয়ের হাতছানি। একটা গাছের আড়ালে অপরিচিত ফুলের উঁকি। অশোক সেখানে সচকিত হয়ে উঠে গেলো। গাছ অচেনা, ফুলও অচেনা বিচিত্র, যেন সুন্দরী শ্যামা গোপবধূ রসের হিল্লোল তুলে বৃন্দাবনকে পুনর্জীবিত করেছে, এনেছে সতীমনে প্রদাহ, কুমারী মনে রাঙ্গার দুলালের ইঙ্গিত, প্রৌঢ়ার নাসায় বিলুপ্ত যৌবনের দীর্ঘশ্বাসের আকুতি। অশোক এ স্বৈরিনীর নাম খুঁজতে গাছে ঝোলানো টিনের ফলকটি টেনে বার করলে, লেখা আছে নিগ্রেট। পাগলকরা গোপবালা বটে, কিন্তু এদেশের নয়, ওদেশের নয়—বিশ্বের। মনে পড়ে গেলো, কয়েক বছর আগে সে নিগ্রেটকে এনেছিলো এবং তারপর যন্ত্রচর্যা তার বিস্মৃতি ঘটিয়েছিলো। অশোক চক্ষু ভরে নিগ্রেটের যৌবন-সমারোহ দেখলো, দেখলো গোলাপের এ-কালো মেয়ে সত্যই স্বৈরিনীরূপা। এ ফুল মিনির কবরীতে মানায় না। মিনির প্রতিযোগিনী যারা তারা সূর্যোদয়ের, অস্তাচলের আলো, হিলুডার অরুণিমা, লেডার প্রগল্‌ভতা, শট্ সিল্কের ব্রীড়া, হিলিংডনের বাসন্তীর পূত নম্রতা। স্বৈরিনী নিগ্রেট গোধূলি অন্তের, ওর অঙ্গে লেখা আছে—হাতছানি, ইঙ্গিত, ফিস্‌ফিস্ কথা, কুলের মাথা খাওয়া, ইহকাল পরকাল ডুবিয়ে দেবার বিপুল উত্তেজনা। হঠাৎ অশোকের মনে মন্দার ক্ষণ ফিরে এলো।

গোটা কয়েক ফুল নিয়ে অশোক বাইক চেপে মন্দার কাছে গেলো, অনেকদিন পরে। মন্দা কামিনী গাছের তলায় চৌকিতে বসেছিলো।

অশোককে দেখে তার ঠোঁট অভিমানে স্ফুরিত হয়ে উঠলো কিন্তু অশোক ফুলগুলি হাতে দিতেই সে হৃষ্ট হয়ে, আশ্চর্য হয়ে বললে, ওমা, ঘর-ছাড়ানে, কুলভাঙানি এ-কুলটাকে কোথা পেলে? এযে পাড়া-মাতানে রূপের ডালি! ফুলগুলি মাথায় দিতে দিতে আবার মন্দা বললে, ও অশোক, বলোনা, আজকাল কুলটার চাষ করছো নাকি? খিলখিল করে হেসে উঠলো সে। নয়নে বিদ্যুৎ ছুটিয়ে হঠাৎ চোখ নামিয়ে বললে, কুলটা কথাটা বেশ মিষ্টি, না অশোক? যেন কাছে ডাকে। বলোনা, আমি কি কালো এরই মতো? এ ফুল মাথায় দিয়ে রাত্রে যদি স্বপ্ন দেখি, যমুনাতীরে হারিয়ে গেছি বাঁশি শুনে, আমার কুল গেছে, কাল গেছে! তখন কি হবে? কালিন্দী সলিলে ভেসে যাবো মন্দির থেকে ফেলে-দেওয়া উচ্ছিষ্ট জবার মতো? বলোনা, আশ্বাস দাও না! মন্দার চোখ সে গোধূলির আঁধারেও ঝকমক করে উঠলো।





উনিশ

প্রমোদ অশোককে উপদেশ দিয়েছিলো, পালাও এ-হৃতশ্রীর হাত থেকে। সে নিজে একদা সময় থাকতে পালিয়েছিলো। কিন্তু অশোক নিজের প্রকৃতি গুণে জানতো, যুদ্ধ যখন ঘন তখন পালানো যায় না, পালাতে নেই। কুস্তি লড়ায় 'বস্ করো' বলা লজ্জার। চরম অবসাদ ক্লান্তিতেও ওর খলিফা কোনোদিন অশোকের মুখ দিয়ে এই 'বস্ করো' কথাটা উচ্চারণ করাতে পারেনি। এ-দেশের পুরানো লোকেরা বলে, 'গিরতে হেঁ শহ্‌সওয়ারই ময়দানে জঙ্গ্‌মে।' সওয়ারই লড়ায়ে পড়ে, এ অধিকার শুধু যোদ্ধার। যারা তাকিয়া ঠেস দিয়ে অঙ্গে যুদ্ধের ধূলি না মাখার, চোট না খাওয়ার নিরপত্তার আরাম খোঁজে তাদের পতন বিপর্যয়ের ভয় কোথায়! অশোক একবারও পালাবার কথাটা মনে আনতো না। ক্ষতি, ক্ষতি, ক্ষতি, চারদিকে শুধু বিনষ্টি। ঋণের অসহ্য ভার, ঋণের অপরিমিত গ্লানি অপমান। তার পারিবারিক ভরণপোষণ চলে উঞ্ছবৃত্তি দিয়ে, অর্থাৎ যা অপরকে দেয় তারই অন্যায় অংশ নিয়ে। কিন্তু তবুও সে অশেষ অমানুষিক পরিশ্রম করে, দায়িত্বের কাছে মুখ লুকোয় না, আর পলায়নের দ্বারা আত্মরক্ষার কথা মনের কোণেও আনে না।

তার মাত্র জনকয়েক তো শ্রমিক, তারাও বিদ্রোহী। এ বিদ্রোহ তাদের

ন্যায়সঙ্গত। তারা অভাব অনটনের কষ্ট ভোগ করে কিন্তু মালিককে ছাড়ে না। তারা সর্বনাশের সহায় হয়ে প্রভুর সর্বনাশের বিসর্পণ দাঁড়িয়ে দেখে। একদা অশোকের মনে হোলো সাহেব ফোরম্যান রাখলে এ বিদ্রোহ দমন করা যায়। তখনো সাহেবদের বিষয়ে প্রবাদ ছিলো, তারা শ্রমিককুলকে শাদা চামড়ার দাপটে আয়ত্ত করে রাখতে পারে। এ ছাড়াও দীর্ঘকাল থেকে অশোকের মনে ছিলো সাহেব সেবক না রাখলে তার নিজের মেরুদণ্ড সোজা হবে না, এ সেবা উপভোগ করার মতো আত্মতৃপ্তিও নেই আর কিছুতে। ডনোহিউ কোথা থেকে ফেলিঙ্গরকে খুঁজে আনলে। গরীব হলেও ফেলিঙ্গর খাঁটি ইংরেজ, কোথা কোন কাঁচের কারখানায় কাজ করতো। অশোক চারদিনেই উপলব্ধি করলে এ যেন ক্ষুৎপিপাসা পীড়িতের দরজায় বাঘ বেঁধে রেখে ভয় দেখানো, যাতে তারা অন্নপীড়ার চেয়ে ভয়টাকেই বড়ো বলে মানে। ফেলিঙ্গরের মতো কোনো হিন্দুস্থানীও বোধহয় এতো হিন্দুস্থানী গালি আর শ্লেষ জানতো না। তাকে এক মাসের মধ্যে ছাড়তে হোলো। আর যাই হোক, অন্নের বদলে গালি দেওয়ানোটা যায় না।

ফেলিঙ্গর যখন এসেছিলো গিনি তখন চক্ষুওয়ালায়। এবার মিনি যেতে চায়নি, কারণ এ যাওয়ায় তার সম্মানবোধের হানি ছিলো। সে জানতো ব্যয় লাঘব করবার জন্য অশোক তাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়েছিলো। সব মেয়ের মনেই বুঝি সেই দক্ষযজ্ঞের সতীর অভিমানটুকু সুপ্ত থাকে। শ্রীহীন স্বামী ফেলে, শ্রীহীনতা নিজের অঙ্গে মেখে কোনো সচেতন মেয়ে আর

াথা উঁচু করে বাপের বাড়ি প্রবেশ করতে পারে না, তাদের মাথা াড়া করে রাখবার সবচেয়েও কঠিন স্থান একমাত্র এইখানে। অশোক াত্যই মিনির পরিবর্তে ফেলিঙ্গরকে এনেছিলো।

ফেলিঙ্গর গেলো কিন্তু অশোকের তখনকার মনের ঝোঁকে মিস্ ডলফিন এলো। তার মন খুঁজলে পাওয়া যেতো, একদা সে কার লেখায় পড়েছিলো য এদেশের ছেলেদের বিলেত যাওয়া দরকার, মেমসাহেবে জুতো ব্রুশ না করে দিলে তারা মানুষ হয় না। এ মোহ ছাড়া এটা হোলো তার আত্মরক্ষা করার শেষ ফন্দি। যদিই বা মেমসাহেবের দৌলতে কাজের সমারোহ আসে। একটি বছরের কাজের বন্যা তাহলে তার ঋণভার, ক্লেদ অবসাদ সবই ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

এই মেয়েটিকে রেখে অশোক মিনিকে সে-কথা লিখেছিলো, মিণ্টি, কাজের গরজে ওকে রাখলুম। হয়তো ওর মুখ দেখে কাজ আসবে। উপায়টা বিশ্রী, কিন্তু কি করবো, আমার যে আর অন্য পথ নেই। কিছু মনে কোরো না তুমি।

মিনি উত্তর দিয়েছিলো, তোমার চেয়েও আমি বুঝিনে। যা ভালো বোঝ, করো। কিন্তু আমাকে নিয়ে যাও, আর ভালো লাগে না। চক্ষুওয়ালার চোখে আর মণি নেই।

মিস্ ডলফিন নিজের মুখ দেখিয়ে ওদিকে শাহরণপুর আর এদিকে রায় বেরেলি পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতে থাকলো।

এক রাত্রে মন্দার বাড়ি গানের জলসা। নিমন্ত্রণ পেয়ে অশোক সেখানে গেলো। গোলকামরায় মজলিস বসেছে। প্রমোদের নবাগত এক

ব্যারিস্টর বন্ধু গাইছে, 'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনি অবনী বহিয়া যায়।' গাইতে পারে বটে লোকটি! প্রমোদের মেসন হ্যামলিন অর্গ্যান আর্জ পাগল। মন্দা এ বড়ো বাজনাটা ছুঁতো না কোনোদিন কারণ এ চর্চ অর্গ্যানের সুর তাকে ছাপিয়ে দিতো। অশোক এককোণে বসে তন্ময় হয়ে গান শুনছিলো। বেয়ারা এক সময়ে ওর পেছনে এসে চুপি চুপি বললে, মেমসাহেব ডাকছেন হুজুরকে।

অশোক বাইরে এলো। বেয়ারা বললে, মেমসাহাব ইন্দ্রবেলার তলায়। কামিনী গাছকে ওরা ইন্দ্রবেলা বলে। বিশাল গাছটায় ফুলসজ্জা লেগেছে। ফিনিক-ফোটা জ্যোৎস্না সে ফুলের অরণ্যে রাত্রি বেলাতেও মৌমাছিদের পথ ভুলিয়ে ঘরছাড়া করে দিয়েছে। গাছটার কোন নামটা ঠিক কে জানে! মর্তের লোকে বলে কামনা জাগানো কামিনী, স্বর্গে ও ইন্দ্রবেলা, উর্বশী মেনকার কঙ্কনবলয় কবরীর অলঙ্কারের ফুল যোগায় বোধ করি।

মন্দা বসেছিলো তক্তাপোশে। অশোক কাছে যেতে বললে, বসো আমার সামনে। অশোক তার সমুখের বেতের চেয়ারটায় বসলো, জিগগেস করলে, গান ছেড়ে এখানে আপনি, খবর ভালো তো বৌদি?

মন্দা চোখ পাকিয়ে বললে, তুমি নাকি একটা মাগিকে রেখেছো অশোক? অশোক হাসলে। উত্তর দিলে, কথাটার নানা রকম মানে হতে পারে বৌদি।

নানা রকম নয় গো, এক রকম মানে যেটা সহজ, সোজা, লোকগ্রাহ্য। কে এ ছুঁড়ি? মিস্ ডলফিন? ডলফিন মানেই তো গভীর জলের মাছ!

ও পেত্নীকে কেন জোটালে? মিনি পোড়ারমুখিরই বা যাওয়া কেন? যার করছি তার যাওয়া।

াফিয়ে উঠলুম যে বৌদি! কোন প্রশ্নটার উত্তর দেবো?

স কি মিনির চেয়েও, আমার চেয়েও ভালো দেখতে? কেন রাখলে ওকে?

মন্দার রাগ দেখে অশোক খুব হাসলো, অবশেষে তার মুখের দিকে চেয়ে বললে, তার মুখই দেখিনি আজ পর্যন্ত, তা তুলনা করবো কি! আপনার চেয়েও কি ভালো দেখতে কেউ হতে পারে বৌদি!

আর খোশামোদ করতে হবে না তোমাকে। বলে রাখছি অশোক, কাল সকালে তোমার ছাপাখানায় গিয়ে ঝাঁটা মেরে এই ছুঁড়িকে বিদায় করে আসবো। আর, ভালো চাও তো মিনিকে আনো। এ রকম করে দূরে রাখতে নেই।

মিস্ ডলফিনকে রাখার কারণ জানালো অশোক। মন্দা আগ্রহভরে তার কথা শুনে উত্তর দিলে, এতো সঙ্কটে পড়েছো একদিনও তো বলোনি! আসোই না তা বলবে কি! কিন্তু মিনি জানে?

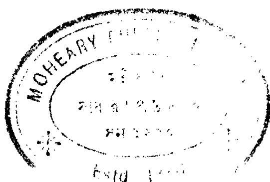
জানে বই কি। মিনি ছাড়া আমার বাবাও জানেন, তাঁর মতও নিয়েছি। ডলফিন এখন নিমজ্জমানের তৃণ, কোনো ভয় নেই বৌদি!

নেই বা কি করে বলি। মন্দা সস্নেহ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বললে, আমার স্বামীপুত্র হলে আমি বিশ্বাস রাখতে পারতুম না অশোক, কিন্তু তোমার ওপর আমার বিশ্বাস অগাধ। তবু মিনিকে আনো। দশ দিনের বেশি ছাড়াছাড়ি থাকার দায় আছে, জানো?

অশোক মন্দাকে ব্যবসাসঙ্কটের কথা বলেছিলো, ঋণের জ্বালার কথা বলেনি। মন্দা ভাবলে সঙ্কট কাটিয়ে ওঠার, কাজ জোটাবার এটা সহজ উপায়, ডেকয় ড্যাক দিয়ে শিকার করার মতো। সে তবুও উদ্বিগ্নমুখে বললে, অশোক, একটা কথা বলি? পাপাচরণ তুমি করবে না জানি। তবুও বলে রাখি, যদি বিস্মৃতি আসে, একদিনের জন্যও পাপ তোমাকে ছোঁয়, তার প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ কোনো প্রমাণ না থাক, স্ত্রী অব্যর্থভাবে তা অনুভূতি দিয়ে বোঝে, এ বোবা-বোঝার অভিশাপ যেন তোমাদের জীবনে না আসে। কি বলো, মনে থাকবে? ও অশোক, বলোনা?

থাকবে বৌদি। আপনার ভয় নেই! কিন্তু আজ যে বড়ো পাপকে স্বীকার করছেন?

ধেৎ। আমি কি ডলফিন? সেই তো পাপ! পণ্যসুলভাই পাপের সম্ভাবনা আর পাপ গো ঠাকুর!





কুড়ি

বালির বাঁধ দিয়ে কি ধ্বংসের তরঙ্গ রোধ করা যায়! ডলফিন অশোকের বিনষ্টি ঠেকাতে পারলো না। অশোক তার দিকে চেয়ে দেখুক না দেখুক, ডলফিন সুন্দরী ছিলো, কিন্তু সুন্দর মুখের জয় যে সর্বত্র তাকে দিয়ে এ-কথা প্রমাণ হোলো না। ডলফিন প্রথম যার কাছে যায় সে প্রচুর কাজ দেয়, কিন্তু দ্বিতীয়বারে সে আর কাজ না দিয়ে তার কাছে প্রেম নিবেদন করে। আশোকের গ্রাহকেরা যেন মনে করতো, দেশী কারবারে এই মেয়েটার সংযোগ যেন তাকে সুলভ করে দিয়েছে সকলের কাছে! অশোকের বন্ধুবান্ধব নানা ইঙ্গিত করতো, সে ইঙ্গিত সম্মানের নয়। অবশেষে সে আবিষ্কার করলে তার বুড়ো মেশিন ফোরম্যান পর্যন্ত ডলফিনের প্রেমিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটি পরিশ্রম করতো খুব। অশোক অনেকদিন কাণাঘুষা অগ্রাহ্য করে অবশেষে ডলফিনকে বিদায় দিতে বাধ্য হোলো।

মিনি চক্ষুওয়ালায় অধীর হয়ে উঠেছিলো নিজের তাগিদে ও মন্দার তাগাদায়। অশোক কিন্তু তাকে ফিরিয়ে আনবার দিন ক্রমাগত পিছুতে লাগলো। সর্বনাশ তখন শিয়রের দিকে। তার পদধ্বনি শোনা যায়, ঐ আসে, ঐ আসে! বুক পোরা তার মৃত্যুভয়। মনিবন্ধে তার নাড়ী নেই, খুঁজলে পাতলে কমুইএর কাছে বুঝি শেষ স্পন্দনের সাড়াটুকু

পাওয়া যায়। উদ্বিগ্ন সতর্ক দিনের, অনিদ্রার ঝিঁঝি-ডাকা রাতের প্রতিক্ষণে অশোক দরজার দিকে চেয়ে মৃত্যুদূতের আগমন প্রতীক্ষা করে—ঐ আসে, ঐ আসে। কিন্তু তখনো সে সর্বনাশে সর্বস্ব আহুতি দিয়ে ভস্মাবশিষ্টটুকু নিয়ে পালাবার কথা ভাবে না। তার তৈল-সুচিক্কণ যন্ত্রগুলিকে সে ভালোবাসতো। সর্বনাশের একটা মাদক নেশা সে ভালোবাসাকে আরো নিবিড় করেছিলো শেষ মুহূর্তে। অধীর উন্মাদ অপেক্ষা তার নিয়তির।

অশোকের চিত্ততলে মিনিকে চোখের আড়ালে পাঠাবার একটা সুগভীর কারণ ছিলো। একদা সে হঠাৎ সে-কথাটা উপলব্ধি করে ভয়ে আত্মহারা হয়ে নিজের ডান হাত কামড়ে ধরেছিলো, যেন হাতটা তখনই গভীর কোনো অপরাধে রত। মিনির অলঙ্কারের বাহুল্য ছিলো। কোনো একটা ক্ষণে সালঙ্কৃতা মিনিকে দেখে অশোকের মনে শয়তান জাগলো। বিভ্রম ঘটানো মধুর হাসি হেসে সে বললে, ওই তো রয়েছে মিনির অঙ্গে তোমার মুক্তির উপায়! শয়তান যুক্তি দিলে, স্ত্রীর শোভার চেয়ে মুক্তির দায়, ইজ্জতের দায় অনেক বড়ো। লম্পট যেমন কামাহত, লুব্ধ দৃষ্টি দিয়ে ঈপ্সিত কোনো রমণীর দিকে চায়, অশোক তেমনি মুহূর্তাংশের জন্য লোলুপ উদগ্র লালসায় মিনির অলঙ্কারগুলিকে দেখেছিলো। চিন্তার গতি বিদ্যুত ঝলকের চেয়েও প্রখর। সে দেখেছিলো শুধু নয়, সেই ক্ষণবিন্দুটুকুতে পত্নীর অলঙ্কারগুলির দাম খতিয়ে নিজের ঋণের অঙ্কটার সঙ্গে তুলনা করেছিলো। এ-চিন্তার সে কি বিষম গ্লানি, সে কি ভয়, সে কি কদর্য লজ্জা! হাতে অশোকের কালশিরা ফুটে উঠলো, আঘাতটা

তার সম্বিৎ ফিরিয়ে দিলে। জোর করে অশোক গয়নাগুলো ব্যাঙ্কের হিফাজতে ফিরে পাঠালে আর মিনিকে পাঠালে চক্ষুওয়ালায়। অলঙ্কার-উজ্জ্বল লোভনীয় বহিরাবরণ ছাড়িয়ে প্রিয়তমা, সখি, সহচরী মিনিকে দেখতে পাওয়ার ক্ষমতাটুকু অশোকের লোপ পেয়েছিলো।

মিনি ছিলো না বলে মন্দা অশোককে আজকাল প্রায়ই খাবার নিমন্ত্রণ করতো। অশোক আত্মগোপন করা যথাসম্ভব প্রসন্ন মুখ নিয়ে সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতো। সামান্য একটু চিন্তান্বিত মুখকে মন্দা পুরুষের শোভা বলে জানতো। তা নিয়ে অশোককে কোনো প্রশ্ন করতো না। সেদিন মন্দা লিখে পাঠালে আজ রাত্রে আমার কাছে খেও অশোক। উনি গেছেন এলাহাবাদ। সকাল সকাল এসো। প্রমোদ তখন সরকারী অ্যাড-ভোকেট, অনেক তার কাজ।

অশোককে দেখামাত্র মন্দা শিউরে উঠলো। ভয়ার্ত স্বরে জিগগেস করলে, কি হয়েছে বলো, ও অশোক, তোমার পায়ে পড়ি, বলো। তোমার চোখে সর্বনাশের ছায়া, তোমার মুখে মরণের পাণ্ডুর মলিনতা। মন্দা চকিতে দুহাতে তার মুখ তুলে ধরে বললে, বলোনা অশোক। ও অশোক এ যে অসহ্য! বলোনা কিসের বিভীষিকা তোমার মুখে?

মনুষ্যত্বের নিয়মে নারীও তো নানা প্রকাশের গাঁথা একখানি মালা! পুরানো কালের কবি জেনেছিলো তার নানা রূপ, একই নারীর কতো না সম্ভাবনা—সেবায়া ভগ্নি, ক্ষময়া ধরিত্রী—। এই বিষম ক্ষণে মন্দার ভিতরের বান্ধবী গেলো, কেলিপরায়না পরকীয়া গেলো, প্রগল্‌ভা নর্মসহচরী গেলো, আশীর্বাদরতা শুভার্থিনী ভগ্নি লুপ্ত হোলো। মন্দার

মুখে সে মুহূর্তে জাগলো মায়ের উৎকণ্ঠা, তার চোখে জ্বলে উঠলো ত্রাস। অশোককে রক্ষা করবার অসীম অসহ্য আকুলতায় তার অন্তর মথিত হয়ে উঠলো।

অশোকের চোখে জল এলো। তখন তার নিঃসহায় ভয়ভীত চোখে ক্ষণে ক্ষণে জল আসতো। সূর্যের আলো অবলুপ্ত, অশোক ঝাপসা চোখে অন্ধকার পৃথিবীতে কেবল নানা বিভীষিকা দেখতো। মন্দার হাত ছাড়িয়ে সে মাথা নিচু করে বসে পড়লো।

মন্দাও বসলো ওর সামনের মোড়াটায়। অশোকের হাঁটুতে হাত রেখে আবার বললে, ও অশোক, বলোনা, মিনতি করি বলোনা, কি হয়েছে তোমার ? আমি কী করবো ? বুঝতে পারছিনে আমি কি করবো !

অশোক ধীরে ধীরে সব জানালে তাকে, শেষে বললে, কাল নিলামের নোটিস লটকে দেবে, বৌদি।

কতো দেনা ? অধীর অস্থির কণ্ঠে মন্দা জিগগেস করলে, কতো দেনা তোমার ? ও অশোক ?

বারো হাজার টাকা বৌদি !

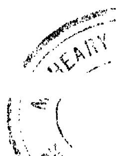
বারো হাজার ! বারো হাজার ! আঃ, বাঁচলুম ! ভগবান আমাকে বাঁচালেন ! মন্দা ত্বরিৎ গতিতে উঠে গেলো।

ফিরে এলো একটা ছোটো বাক্স নিয়ে। অশোকের কোলের ওপর সেটা রেখে ডালাটা খুলে দিয়ে বললে, তোমায় দিলুম। আমার মাতৃধন বটে কিন্তু কাজে লাগে না। অশোকের সকল ইন্দ্রিয়বোধ লুপ্ত হয়ে গেলো। একবার সে মণিমুক্তা স্বর্ণালঙ্কারের স্তূপটি দেখে সে মন্দার মুখের

দিকে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলো। মন্দার মুখে মুক্তির স্নিগ্ধ হাসি। সে বললে পনেরো হাজার টাকা দাম হওয়া উচিত এ-সবের। সঙ্কটকালে ওঁকে দিতে হয়নি, দিতুম কিনা কে জানে! রঞ্জুকে রক্ষা করবার জন্যে রেখেছিলুম এ-সব। মন্দা শিউরে উঠলো। দরকার হয় সে কাজ তুমি করো, অশোক। পারো, ফেরত দিও, না পারো দিও না। রঞ্জুর বাঁচার মতো তোমার বাঁচাই আমার জীবনের সার্থকতা।

অশোকের জিহ্বায় এতোক্ষণ সাড় ছিলো না, সাড়া ছিলো না। অলঙ্কারের বাক্সটি মাটিতে রেখে দাঁড়িয়ে উঠে হঠাৎ সে চীৎকার করে উঠলো, না না না। আমার কাছ থেকে আমাকে রক্ষা করুন বৌদি!

সে অন্ধকারে ছুটে বেরিয়ে গেলো।





একুশ

ক্ষুব্ধ সাগর শান্ত হয়। ভুমিকম্প বিধ্বস্ত দেশকে প্রকৃতি আবার পূরণ করতে থাকে। উল্কাপাতের পথও নীহারিকাপুঞ্জে ঢাকা পড়ে যায়। ভাগ্যবিপর্যয়ের অন্ধকারের পর অশোকের চোখে আবার আলো ফিরে এলো। যা ফুরিয়ে গেছে তার জন্য আর তার চিত্ত অনুশোচনা করলো না, কাঁদলো না। অশোকের পক্ষে এ ফুরিয়ে যাওয়া নয়—পাপমুক্তি, শাপমুক্তি যেন।

মন্দা আর তাকে ডাকেনি। অনেকদিন পরে মন থেকে লজ্জা তাড়িয়ে অশোক তার কাছে গেলো। বেয়ারা ভিতরে খবর দিয়ে এসে বললে, বসুন একটু। অনেকক্ষণ পরে মন্দা বাইরে এলো। আগে কোনোদিন অশোককে তার দেখা পাবার জন্য এতো দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়নি। তাকে দেখে মন্দার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো না। প্রসারিত হাতে অশোকের পানে একগোছা চিঠি এগিয়ে দিয়ে মন্দা নিম্নকণ্ঠে বললে, নিয়ে যাও এসব, আর আমার ওতে দরকার নেই। ইচ্ছা করো আমার চিঠিগুলো ফিরিয়ে দিও, দেওয়াই উচিৎ। তুমি একটা শ্রীহীন লক্ষ্মীছাড়া।

দূর থেকেই অশোক নিজের লেখা চিঠিগুলি চিনেছিলো। অকস্মাৎ শ্রীহারানোর কদর্য নালিশে সে বেত্রাহতের মতো চমকে উঠলো।

মন্দার চোখের দিকে মুহূর্তের জন্য চেয়ে থেকে সে নিঃশব্দে সেগুলো হাত পেতে ফেরৎ নিলে। মন্দা আর একটি কথা না কয়ে ভিতরে চলে গেলো।

এতোকালের সম্বন্ধটা এমনি করেই চুকলো। পতিপত্নীর মাঝে বিনষ্ট প্রেমকে পুনরুদ্ধার করবার সম্ভাবনা আছে, পরকীয়া প্রেমে বা বন্ধুত্বে নেই সে শক্তি ও সম্ভাবনা। সেই ক্ষণে একটি হৃদয়াবেগের একটি বিপুল ভালোবাসার ইতিবৃত্তের সমাপ্তি ঘটলো। রসায়ন শাস্ত্রে কেলাসন—ক্রিস্টলাইজেসন-এর কথা আছে। রসে ডুবানো একখণ্ড কাঠে দানার স্তর বেঁধে যায়, কাঠটাকে আর দেখা যায় না। ভালোবাসাও এই কেলাসনের ফল। প্রথম দেখার দিনটির পর প্রেমপাত্র আর রক্তমাংসের মানুষটি থাকে না, প্রেমিকের চোখে সে হয়ে যায় কেলাসনের রসাবৃত অন্য সত্তা। অশোক আর মন্দা দুজনেই পরস্পরকে এই বিচিত্র অঞ্জন চোখে লাগিয়ে দেখতো। মন্দার চোখে অশোকের দানা-বাঁধা রসের আবরণটুকু খসে গেলো, অশোক আবার হয়ে গেলো রক্তমাংসের সাধারণ মানুষ—পথের পথিক, মন থেকে দূরে, মন্দার অনুভূতির বাইরে। তার চক্ষের মণিতে অশোকের স্থান ছিলো, এখন হোলো সে কেবল দৃষ্টিপথের মনুষ্যগোষ্ঠির কেউ একজন, তাই এই শ্রীহারানোর মর্মান্তিক মারাত্মক অভিযোগ। ওদের মন ছোঁওয়াছুঁয়ির কাল গেলো। মন্দা ফিরে গেলো পরস্ত্রীত্বের দক্ষিণ মেরুতে আর অশোক ফিরলো পর-পুরুষের উত্তর মেরু-প্রান্তে। তাদের মাঝে রইলো দিগদিশাহীন সীমাহারা অপরিচয়ের মরুভূমি।

চিঠিগুলো নিয়ে অশোক মন্দার বাড়ি থেকে বেরুলো। ফটকের কাছ থেকে রজনীগন্ধার আকুল সৌরভ ভেসে এলো, যে সৌরভ নিত্য তাকে সুখ-বেদনার মতো মন্দাকে স্মরণ করিয়ে দিতো। এই শেষ দিনটির সন্ধ্যায় সেই সৌরভই হোলো তার অন্তরমন্থন করা বিদায়ের বাণী। বাড়ি এসে অশোক পড়ার ঘরের নিভৃতে আলোর সামনে চিঠিগুলো মেলে ধরলে। পরতে পরতে সেগুলো ফাটা, বারবার পড়েও বুঝি পাঠিকা তৃপ্তি পায়নি। মচমচে বেসিলডন্ বণ্ড কাগজগুলো যেন স্নেহে অশ্রুজলে অথবা বক্ষের স্বেদে সিক্ত নরম। অশোক জানতো চিঠিগুলো মন্দার বক্ষাশ্রয় লাভ করেছিলো। বক্ষস্থলটি বুঝি জগতের সব যুবতী মেয়ের গুপ্তধনের পেটিকা! একদিন কি একটা কথা বা প্রতিশ্রুতি তাকে মনে করিয়ে দেবার জন্য মন্দা একখানি চিঠি বার করেছিলো নিজের বুকের কবোষ্ণ আশ্রয় থেকে। অশোকের রোমকূপে সেই থেকে লেলিহান অগ্নীশিখা বন্দী হয়েছিলো।

চকিতে-দেখা চিঠিগুলোর অক্ষরে বাক্যে কতো না মধু, কতো বিলুপ্ত স্মৃতি অশোকের মনে জাগলো, কিন্তু সে সবলে পড়বার লোভ সম্বরণ করে চিঠিগুলো একটা বড়ো পিরিচে রেখে জ্বালিয়ে দিলে। আগুনের পরিণতি আগুনেই হোলো, যদিও এক আগুন ছিলো দেহমনকে স্নিগ্ধোষ্ণ করবার, অন্য এ-আগুনটায় কেবল বিষম দহন জ্বালা। কাগজের পরতে পরতে কিনারায় কিনারায় অগ্নিশিখা যেন চটুল নর্তকীর মতো নৃত্যপটু পায়ে ছুটে বেড়াতে লাগলো। চিত্তের এই হোমানল অবশিষ্ট রইলো ভঙ্গুর অঙ্গারে। সে অঙ্গার থেকে কিন্তু অনেক লেখা মুছে গেলো না, শব্দ

বাক্যের কঙ্কালের মতো সেগুলো ফুটে রইলো। নিগ্রেট গোলাপটার মূলে অশোক সে ভস্ম পুঁতে দিলে। একদিন মন্দার কবরীর জন্য এ-ফুল ফুটেছিলো। মন্দার মেঘবরণ চুলে সে-ফুল গোপন ইঙ্গিতের মতো মিশিয়ে থাকতো।

ছাইগুলো মাটিতে মিশিয়ে দিতে দিতে অশোক নিগ্রেটকে বলছিলো, কালো মেয়ে আর ফোটাসনে ফুল। তোর অবশিষ্ট কাল বন্ধ্যা হয়ে থাক তুই। আমার মনে থাক, তুই শ্যামা, মন্দার মতো, ডুব জলে গাঢ় শ্যামশ্রীর মতো, জলপৃষ্ঠে যার সে গভীরতার কোনো ইঙ্গিত নেই।

ওমা, ভর-সন্ধ্যেবেলা তুমি বাগানে করছো কি ? আমি জানি বেরিয়েছো। গাছে ওকি দিচ্চো, পট্যাশ ?

মিনি কাছে এসে দাঁড়ালো। অশোক মুখ তুলে বললে, তুমি পট্যাশ বলতে পারো, আমি বলবো মন-পোড়ানো ছাই।

খিলখিল করে হেসে উঠলো মিনি, জিগগেস করলে, কে পোড়ালে গো ? আমি ? মন পেলুম কবে যে পুড়িয়ে দেবো।

অসহ্য অপরাহ্ণ বেলা। হাতছাড়া হয়েছিলো বলে অশোকের তীক্ষ্ণ হয়ে মনে পড়লো, বেলাটা ছিলো ঘর-ছাড়ানে। আগে চারটে না বাজতে বাজতে ক্রীড়ার উন্মাদনা তাকে টেনে নিয়ে যেতো কোনোদিন তার নিজের ব্যায়ামাগারে, কোনোদিন ফুটবলের মাঠে, আর টেনিস কোর্টে যেদিন মন্দা তাকে ডাকতো। সময়টা ফুটবলের নয়, অশোক হকি খেলে না। সে ভেবে দেখলে, বুঝি বয়সও গেছে এসব খেলার। সে খলিফাকে বললে, সকালে নয়, খলিফা, বিকেলে লড়াও, মচ্ছিগোতা আয়ত্ত করতে

দীর্ঘতর সময় দেবো। খলিফা দুদিনে হাঁফিয়ে উঠলো, বললে, হুজুর, আপ বহৎ তৈয়ার হুঁয়, মুঝ্‌সে বস্‌ কহলওয়া দিয়া। অশোক ডনোহিউকে বললে, আর হপ্তায় দুদিন নয়, ডন, রোজ লড়বো, অ্যাণ্ড ইউ স্ম্যাশ মাই নোজ অ্যাণ্ড লেট মাই ফিভরিশ ব্লড আউট। কিন্তু ডনোহিউ,—যাকে অশোক ছুঁতে পারতো না—বিস্মিত হোলো নিজেই রক্তাপ্লুত হয়ে, তার ভাঙা থ্যাবড়া নাক আবার ভাঙিয়ে। অতৃপ্ত অধীর হয়ে অশোক হ্যামারে হাত দিলে। তার নিত্যকার নিক্ষেপের পরিধি পার হয়ে শৃঙ্খলিত লোহার গোলাটা সুদূরের ডাহ্‌লিয়ার হলিহকের কেয়ারীগুলো ছিন্নভিন্ন করলে, যেন আকাশ ভেদ করে ছুটে যেতে চাইলে। পেশীর অধীর শক্তিতে অশোকের আর যেন কোনো অধিকার নেই, তাকে আয়ত্তে রাখার, নিরুদ্ধ করার অপার আনন্দ নেই। বিশৃঙ্খল শক্তির প্লাবন জেগেছে তার দেহে প্রলয়ের কুল-ভাঙানো আবিল জলের মতো।

এক উগ্র আবেগের নিশীথে অশোক মিনিকে জড়িয়ে ধরলে। মিনি তার সীমাজ্ঞানহীন অধীর নিষ্পেষণে বিবর্ণ রুদ্ধশ্বাস হয়ে গেলো। দম দিতে গেলে স্প্রিং কেটে যায় বলে অশোক ঘড়ি ব্যবহার করতে পারতো না। তবুও মিনি জানতো অশোকের আঙুলে ছিলো বীনা বাজাবার উপযুক্ত সূক্ষ্ম কোমলতম অনুভূতি। মন্দা জিঞ্জির কেড়ে নিয়ে আবেগ-অন্ধ করে যেন একটা উদ্দাম বন্য পশুকে ময়দানে ছেড়ে দিয়েছে।

একদিন বিকেলে প্রেসবদ্ধ র‍্যাকেটটার দিকে চেয়ে অশোকের মনে হোলো, রাধিকার সহস্রছিদ্র কলঙ্ক-কলসীর মতো সেটা আর অমৃত-সেচা কিছু নয়। সায়াহ্নে শুষ্ক নদীবক্ষ পার হয়ে চক্রবাকবধূর সঙ্গে

চক্রবাকের মিলিত হবার মতো উত্তেজনার ইঙ্গিত যেন র‍্যাকেটটা থেকে হারিয়ে গেছে।

র‍্যাকেটে আবদ্ধদৃষ্টি অশোককে দেখতে পেয়ে মিনি পর্দার ওপারে থমকে দাঁড়িয়েছিলো। সে অশোকের বুকের কাছটিতে এসে দাঁড়ালো আর তার জামার একটা বোতাম খুঁটতে খুঁটতে মৃদুস্বরে জিগগেস করলে, হ্যাঁগো ও-পাড়ার খেলা তো চুকলো, খেলবে আমার সঙ্গে? সে খেলা তোমার বিড়ম্বনা হবে জানি, তবুও নেবে আমায় সাথী করে?

তমাম শুদ

